সেন্সার ও সিনেমা

ভারতীয় অভিজ্ঞতা
১৯২০-১৯৪৭

প্রমা

প্রমা প্রকাশনী

৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ । কলকাতা ১৭

স্বত্ব : শ্রাবন্তী ভৌমিক

প্রথম প্রকাশ
১৪ এপ্রিল ১৯৫৮

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

প্রকাশক
সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী
৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ | কলকাতা ১৭

মুদ্রাকর
কালাচাঁদ ঘোষ
বাণী আর্ট প্রেস
১১ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট | ৭/১ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

বাবাকে, মাকে

ভূমিকা

চলচ্চিত্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নানা সংবাদ প্রকাশিত-পরিবেশিত হয়—অনেকগুলিই নিছক মুখরোচক, কোনো-কোনোটি অবশ্য গভীর ইঙ্গিতবহ। গুণগত বিচারে এসবের মূল্য যা-ই হোক্, ঘটনা এটাই যে, এদেশে আছে চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের এক ব্যাপক আয়োজন। ব্যাপ্তির চেয়েও এই আয়োজনের লক্ষণীয় বিষয়টি হলো এর দীর্ঘ আয়ু। —ভারতে চলচ্চিত্রের আসন স্থায়ী হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এদেশের বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রশাসনিক উদ্যোগে এবং তৎপরতায় এখানে চালু হয়ে যায় চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণ। এবং এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, স্বাধীন ভারতে বৃটিশ-প্রবর্তিত শাসনপদ্ধতির নানারকম সংস্কার সাধিত হলেও চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের নীতি-প্রকরণ প্রক্রিয়া প্রায় অপরিবর্তিতই আছে।

এজাতীয় উপলব্ধিতে পৌঁছনোর পর এই ধারাবাহিকতার মূলে প্রবেশ করার একটা চাহিদা স্বতঃই জন্ম নেয়। জানতে ইচ্ছে করে, ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র-মাধ্যমটি এমন কোন্ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়েছিল, যার প্রতিক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়েছিলেন কঠোর এক নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খলে সেটিকে বাঁধতে। স্বাধীন ভারতের সরকারও সেই শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা তো করেনই নি, উপরন্তু সেটিকে সযত্নে রক্ষা করার দায়-দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন নিজেদের কাঁধে—যেন এ-এক গৌরবময় এবং গুরুত্বপূর্ণ 'উত্তরাধিকার'!

মূল-অনুসন্ধানের তাগিদেই এই রচনার সূত্রপাত। 'প্রতিক্ষণ' পাক্ষিকের কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল এটি—পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে হঠাৎই পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়,

মধ্যপথে। তাতে অবশ্য লক্ষ্য-অর্জনের জেদটিকে উশ্‌কেই দিয়েছিলেন তাঁরা। বেশ কিছুদিন পরে 'অনুষ্টুপ' ত্রৈমাসিকের দুটি সংখ্যায় মোটামুটি একটা পরিণতিতে পৌঁছয় এই লেখা। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল—এই সময়সীমায় প্রকাশিত সেই গুচ্ছটিই, সামান্য পরিমার্জনা-সহ, সংকলিত হলো 'প্রমা প্রকাশনী'-র শ্রীসুরজিৎ ঘোষ-এর উৎসাহে।

বলে নেওয়া ভালো যে, এই সংকলন একটি প্রাথমিক তথ্যভিত্তি। এ-বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা-প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছি ভারতের সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদ-এর (Indian Council for Social Science Research) পূর্বাঞ্চল শাখার সৌজন্যে। সেই প্রকল্পের জন্যে সংগৃহীত তথ্যের কোনোকিছুই এই বইতে ব্যবহার করা হয়নি—এই লেখার মেজাজের পক্ষে তথ্যগুলি গুরুভারও হয়ে যেতো হয়তো। সেইসব তথ্যের আধার হবে স্বতন্ত্র ধারার আর-একটি রচনা।

বন্ধুবান্ধব এবং নিকটজনের নিরন্তর উৎসাহের ফসল এই লেখা—যেমন হয় প্রায় সব লেখাই। কিন্তু তাঁদের শুভেচ্ছা বা প্রশ্রয়ে প্রচ্ছন্ন ছিলো না কোনোরকম প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা। নাম উল্লেখের আনুষ্ঠানিকতা তাই বিব্রতই করবে তাঁদের। অপরিশোধনীয় সেই ঋণের স্বীকৃতিটুকু তবু থাক্‌ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে।

১. প্রাক্-কথন

যদি বলি, সেন্সারশিপ বা সরকারী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার জন্ম আদমশুমারি থেকে, তাহলে কথাটা অদ্ভুত শোনাবে। সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোনো সচেতন পর্যবেক্ষক অবশ্য একশো একখানা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেবেন, আদমশুমারিতে পাওয়া অনেক আপাত-নিরীহ তথ্যই রাষ্ট্রস্বার্থের প্রয়োজনে প্রশাসনের চোখে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেইসব তথ্যভিত্তিই কার্যকর একটি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রশাসনকে সাহায্য করে। এসব, বলাই বাহুল্য, জটিল কূটনৈতিক অনুসন্ধানের ফল, এবং এক্ষেত্রে দুটি ব্যাপারের মধ্যে যোগাযোগের চরিত্রটিও পরোক্ষ। কিন্তু প্রাথমিক-ভাবে ভাষার সূত্র ধরে একটু পেছনের দিকে তাকালে প্রত্যক্ষ একটা যোগাযোগের চেহারাও বোধহয় ফুটে উঠবে।

Census থেকে এসেছে Censor।

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য ছিলো নগরসভ্যতা-নির্ভর। ত্রিশ নগরীর জোট 'লাতিন লীগ'-এর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রাধান্য ছিলো এই সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। নগরবাসী এইসব রোমান জনগোষ্ঠীর দুই ভাগ—প্যাট্রিশিয়ান আর প্লিবিয়ান। প্যাট্রিশিয়ানরা অভিজাত ধনবান সম্প্রদায় আর প্লিবিয়ানরা সাধারণ নাগরিক। যাবতীয় প্রশাসনিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধের নিরঙ্কুশ অধিকারী ছিলেন প্যাট্রিশিয়ানরা। তাঁদের সেই অধিকার নিষ্কণ্টক রাখার জন্যে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিলো রোম-এ। প্রত্যেক শহরে একজন করে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নগরবাসীদের

ব্যক্তিগত এবং সম্পত্তিগত যাবতীয় বিবরণ নথিবদ্ধ করতেন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। নগর-সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্যের তদারকিও ছিলো এই রাজকর্মচারীর এক্তিয়ার। ওপরে ওপরে এটি আদমশুমারি হলেও, বকলমে এটি এক ধরনের গোয়েন্দাগিরি। লাতিন ভাষায় এই প্রথার নাম ছিলো 'সেন্সাস' (Census)। বিশেষ্যটি ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়াতো Censere-এ, যার অর্থ, গণনা করা।

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধেই এইসব লাতিন শব্দ, অন্যান্য বহু লাতিন শব্দের মতোই, ইংরেজি ভাষা-ব্যবহারে অনুপ্রবেশ করেছিল। আদমশুমারি অর্থে লাতিন Census বিশেষ্যটির ইংরেজি রূপ দাঁড়ালো Cense—এটা ১৫২৪ সালের কথা। ১৫৩৩ সালের একটি ইংরেজি দলিলে প্রথম ব্যবহৃত হলো Censor শব্দটি। সম্ভবত কোনো ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় আদমশুমারির সঙ্গে জড়িত রোমান রাজকর্মচারীকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছিল। ১৫৯১-৯২ সালের একটি ব্যবহারে Censor কথাটির অর্থ দাঁড়ালো 'বিশেষ কোনো সমাবেশে জন-আচরণের তত্ত্বাবধায়ক'। ইংরেজি ক্রিয়াপদও তৈরি হয়েছে Censor শব্দটি দিয়ে—প্রায় ওই একই সময়ে। ক্রিয়াপদের অর্থ, 'পদাধিকারবলে বই, নাটক, খবর বা চিঠিপত্র পরীক্ষা করা'। স্পষ্টত, সেন্সারপ্রথার আধুনিক ধারণাটি ষোড়শ শতকের এই শেষ দশকেই রূপ পেয়েছে, অন্তত ব্যবহারিক অর্থে—সম্মিলিত মানুষের আচরণ তত্ত্বাবধানের গণ্ডী ছাড়িয়ে সংযোগ-মাধ্যমের খবরদারিতে ব্যাপ্ত হয়েছে এর প্রয়োগ।

আরো কার্যকর এবং নির্দিষ্ট অর্থে শব্দটির ব্যবহার হলো ১৬৪৪ সালে। এই সময় Censor বিশেষ্যটির সংজ্ঞা নিরূপিত হলো এই ভাষায়, '(সেন্সার) একজন সরকারী কর্মচারী, যাঁর কাজ হলো প্রকাশের আগেই বই, পত্রিকা, নাটক ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা এবং এটা নিশ্চিত করা যে, সেগুলিতে নীতিবিগর্হিত বা প্রতিষ্ঠিত রীতি-পদ্ধতির পক্ষে অমর্যাদাসূচক অথবা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু নেই'।

Censor শব্দের সুস্পষ্ট আইনগত প্রয়োগ হলো ১৬৬২ সালে, ইংল্যাণ্ড-এর পার্লামেণ্ট-এ পাস-হওয়া 'অনুমোদন আইন'-এ (Licensing Act)। মুদ্রিত পত্রপত্রিকায় কুরুচিপূর্ণ, সরকারী বা ধর্মমতে আপত্তিকর এবং রাষ্ট্রস্বার্থের পরিপন্থী কোনো কিছু যাতে সাধারণ্যে প্রকাশিত হতে না পারে, সেজন্যে প্রকাশের আগেই সরকারী অনুমোদনের বিধান দেওয়া হলো এই আইনে। সুপ্রাচীন এবং বহুব্যবহৃত একটি প্রথার আধুনিকায়ন হলো এইভাবে।

অবশ্য আধুনিক সেন্সারব্যবস্থার জনক এই 'অনুমোদন আইন'টি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইংল্যাণ্ড-এ শিল্পবিপ্লবের সূত্রে সামন্ততান্ত্রিক প্রাধান্য তখন জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ধনতান্ত্রিক প্রাধান্যকে। ধনতন্ত্রের প্রতিভূ বুর্জোয়াদের অন্যতম দাবি ছিলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। এই দাবির সপক্ষে বহু আন্দোলন হয়েছে ইংল্যাণ্ড-এ। মহাকবি মিল্টন ১৬৪৪ সালে প্রকাশিত 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'য় (Areopagitica) দাবি জানিয়েছেন 'সর্বোত্তম সেই স্বাধীনতা'-র যা মানুষকে দেবে 'সবকিছু জানার অধিকার, অবাধ মতপ্রকাশের অধিকার এবং বিবেকের বিধান-অনুযায়ী কাজ করার অধিকার'। আন্দোলন ফলপ্রসূ হলো ১৬৯৫ সালে পার্লামেণ্ট কর্তৃক 'অনুমোদন আইন' বাতিলের মাধ্যমে।

তারপর থেকে সময়, সমাজ এবং প্রকাশমাধ্যম সাপেক্ষে সেন্সার-প্রথা পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হয়েছে। পরিবর্জনের ঘটনাও যে ইতিহাসে নেই, তা নয়—তবে তা এসেছে ব্যতিক্রম হিসেবে অথবা সাময়িক ভিত্তিতে। সেন্সারব্যবস্থা হয়ে উঠেছে আধুনিক রাষ্ট্রপ্রশাসনের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার।

একটু অন্যভাবে একথাও হয়তো বলা যায় যে, বিশেষ কোনো সময়ে কোনো একটি সমাজে একটি প্রকাশমাধ্যম কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বা প্রভাবশালী, তা নির্ভর করে প্রকাশমাধ্যমটির সঙ্গে সরকারী সেন্সারব্যবস্থার কী সম্পর্ক, তার ওপর। নবীনতম শিল্পমাধ্যম

চলচ্চিত্র এ ব্যাপারে একটি কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারে।

ছায়াছবির পদচিহ্ন পড়েছে যেসব সমাজে, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই তা এক ব্যাপক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার আওতায় এসেছে। নেতিবাচক তাৎপর্যবাহী এই ব্যবস্থায় পরোক্ষে প্রতিফলিত হয়েছে চলচ্চিত্রের শক্তি। লেনিন-এর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'সমস্ত শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্রই আমাদের চোখে গুরুত্বপূর্ণ', সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবেই তাঁর অভিমত। নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রমাণ করেছিল, সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সরকারী উদ্যোগে শক্তিশালী এই মাধ্যমটির ইতিবাচক ব্যবহারও সম্ভব। দুঃখের কথা, সোভিয়েত রাশিয়ার সেই উৎসাহ-উদ্যম দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। চিন্তার প্রয়োগের তুলনায় গা-জোয়ারিটাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে সেখানে। অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। পুঁজিবাদী বিশ্বে যে সেন্সারব্যবস্থা প্রচলিত তার চেয়ে গুণগত বিচারে আলাদা বা তার কোনো সুষ্ঠু বিকল্পের সন্ধান কোনো সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র এখনো দিতে পারে নি। দেশকালভেদে তাই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, তারতম্যও এসেছে নিয়ন্ত্রণের মাত্রায়। তবু রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে দেশে দেশে চালু আছে চলচ্চিত্রে সেন্সার-ব্যবস্থা। তথাকথিত প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিশ্ব—কোথাও নেই বিশেষ ব্যতিক্রম।

ভারতে সেন্সারব্যবস্থা এসেছে সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে। উপনিবেশবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক স্বার্থরক্ষার এক ব্যাপক আয়োজনে পুষ্ট হয়েছে ভারতীয় সেন্সারব্যবস্থা। এর সূচনাপর্বেই চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রশাসনিক মনোভাবের চূড়ান্ত নেতি-বাচক একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতীয় সেন্সারব্যবস্থার ইতিহাস 'কৌলিন্য' দাবি করে বই কি!

২. শৃঙ্খলের রূপ

সন-তারিখের বিচারে ভারতে চলচ্চিত্রযুগের সূচনা ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই। ফ্রান্সের বিখ্যাত সংস্থা লুমিয়ের ব্রাদার্স-এর কর্মচারী মরিস সেস্তিয়ে-র উদ্যোগে বোম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে সেদিন চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন, ভারতে সেই প্রথম। ১৪ জুলাই থেকে অনুষ্ঠান স্থানান্তরিত হলো বোম্বাইয়েরই নভেল্‌টি থিয়েটারে। সেখানে অনুষ্ঠান চলেছিল ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। ভারতের বুকে এই প্রথম চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর নাম ছিলো 'সিনেমাটোগ্রাফি'।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে জনৈক মিঃ স্টুয়ার্ট-এর 'ভিটোগ্রাফ' এলো বোম্বাইয়ের গ্যেইটি থিয়েটারে। সেপ্টেম্বর মাসে এলো 'মোটোফোটোস্কোপ'। পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে, প্রফেসর অ্যাণ্ডারসন এবং মাদ্‌মোয়েজেল ব্ল্যাঞ্চ নিয়ে এলেন তাঁদের 'অ্যাণ্ডার-সনোস্কোপ'।

ভারতের সেই সময়কার রাজধানী কলকাতায় 'বায়োস্কোপ' নিয়ে হাজির হয়েছিলেন জনৈক মিঃ স্টিফেন্স, ১৮৯৬ সালেই। স্টার থিয়েটারে নাটক আরম্ভ হওয়ার আগেই শুরু হতো স্টিফেন্স-এর এই প্রদর্শনী। অবশ্য শোনা যায়, স্টিফেন্স-এরও আগে এখানকার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ চলচ্চিত্র-প্রক্ষেপণ যন্ত্র আনিয়েছিলেন বিদেশ থেকে। তাঁর প্রদর্শনী অবশ্য সীমাবদ্ধ থাকত তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। মাদ্রাজে চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর সূচনা সেখানকার ভিক্টোরিয়া পাবলিক হল-এ, ১৮৯৭ সালে, মিঃ এডওয়ার্ড নামের জনৈক ব্যবসায়ীর হাতে।

এদেশে চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবসা জমে উঠলো অল্পদিনের মধ্যেই।

১৮৯৭ সাল থেকেই একাধিক বাণিজ্যসংস্থা চলচ্চিত্র-প্রক্ষেপণের যন্ত্রপাতি নিয়মিত আমদানী করা শুরু করেছিলেন। স্থানীয় চাহিদা যে তখনই তৈরি হয়েছিল, এসব তারই প্রমাণ।

স্থায়ী ভিত্তিতে প্রদর্শন-ব্যবসায়ে প্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন কলকাতার জামশেদজী ফ্রামজী ম্যাডান, ১৯০২ সালে। ফরাসি কোম্পানী পাথে ফ্রেরিজ-এর কলকাতাস্থিত প্রতিনিধির কাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রক্ষেপণ যন্ত্র নিয়ে ম্যাডান তাঁর ব্যবসা শুরু করেন কলকাতার ময়দানে, তাঁবু খাটিয়ে।

তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখাতেন সে যুগের আর এক বিখ্যাত প্রদর্শক—আবহুল্লালি ইউসুফালি। তাঁর ছিলো ভ্রাম্যমাণ সংস্থা। ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এইভাবে ছবি দেখানোর পর ইউসুফালি অবশ্য বোম্বাইয়ের আলেক-সান্দ্রা থিয়েটারটি অধিগ্রহণ করেন তাঁর ব্যবসার স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে। বড়ো বড়ো শহরে স্থায়ী সিনেমাহল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেলো এইভাবে—অনেকগুলিই অবশ্য পুরনো থিয়েটার হল-এর রূপান্তরিত সংস্করণ।

ইতোমধ্যে হু-একজন উৎসাহী ভদ্রলোক আমদানী করেছেন ছবি তোলারও যন্ত্রপাতি। এঁদের মধ্যে একজন হলেন বোম্বাইয়ের হরিশ্চন্দ্র ভাটওয়াড়েকার, আর একজন কলকাতার হীরালাল সেন। ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ছবি তোলার প্রাথমিক কলাকৌশলগুলি রপ্ত করে এঁরা হুজনে হুই শহরের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার চলচ্চিত্রসাক্ষ্য তৈরি করেছিলেন বিশ শতকের গোড়াতেই। হীরালাল শোনা যায়, জনপ্রিয় কয়েকটি বাংলা নাটকের নির্বাচিত অংশের ছবিও তুলেছিলেন এক সময়ে।

বোম্বাইয়ের এক নাট্যসংস্থার সদস্যরা তাঁদের 'পুণ্ডলিক' নামের জনপ্রিয় নাটকটি পুরোটাই সেলুলয়েডে বন্দী করেছিলেন ১৯০৯ সালে

থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে। চাঁদা তুলে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড কোম্পানীর জনৈক ক্যামেরাম্যান-এর সাহায্যে তাঁরা প্রায় ৮,০০০ ফিট লম্বা এই ছবিটি প্রযোজনা করেছিলেন। মূল দায়িত্বে ছিলেন বলে আর. জি. টর্নি-র নামটিই এ ছবির পরিচালকের নাম হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন এন. জি. চিত্রে। ১৯১২ সালের বোম্বাইয়ের করোনেশন থিয়েটারে 'পুণ্ডলিক' ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুক্তি পেয়েছিল। এটিকেই ভারতে তৈরি প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বলা হয়।

তবে ভারতে চলচ্চিত্র-নির্মাণের পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন বোম্বাইয়ের ধুন্ধিরাজ গোবিন্দরাজ ফাল্‌কে। চলচ্চিত্রায়িত নাটকে আস্থা ছিলো না ফাল্‌কের। চলচ্চিত্রমাধ্যমের জন্যেই তিনি পরিচালনা করেছিলেন একটি কাহিনীচিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র'। সে ১৯১২ সালের কথা। ১৯১৩ সালের ৮ মে বোম্বাইয়ের করোনেশন থিয়েটারে হলো এ-ছবির প্রথম প্রদর্শনী।

তারপর থেকে দ্বিতীয় দশকের শেষ, অর্থাৎ ১৯১৯ সাল, পর্যন্ত বছরে সাত-আটটি করে ছবি তৈরি হয়েছে ভারতের বিভিন্ন শহরে এবং সেগুলি দেখানো হয়েছে সিনেমাহলগুলিতে, বিদেশী ছবির পাশাপাশিই।

অল্পদিনেই তাহলে নতুন এই মাধ্যমটিকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল ভারতীয় জনসাধারণ। অন্যদিকে, সেইটুকু সময়ের মধ্যেই এদেশের চলচ্চিত্রক্ষেত্রে নেমে এসেছে সরকারী নিয়ন্ত্রণের খড়্গ।

সরকারী হস্তক্ষেপের প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯০৭ সালে। তৎকালীন ভারতের অন্তর্গত বার্মা প্রদেশের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বার্মা টাউন্‌স্ অ্যাক্ট ১৯০৭ আর বার্মা ভিলেজ অ্যাক্ট ১৯০৭ নামের দুটি আইন অনুসারে একটি সরকারী নির্দেশ জারী করেন। তার মর্মার্থ, চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের জন্যে আগে থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। রেঙ্গুন শহরে এই অনুমতি দেওয়ার অধিকারী হলেন

সেখানকার পুলিস কমিশনার এবং অন্যান্য অঞ্চলে, সংশ্লিষ্ট জেলা-শাসক। এই ব্যবস্থার প্রভাব অন্যান্য প্রাদেশিক ফৌজদারী কর্তৃপক্ষের ওপরেও এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। ১৮৮৮ সালে প্রণীত পাবলিক রিসর্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী পুলিস বিভিন্ন জায়গায় চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলো, দর্শক-নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে।

প্রক্ষেপণ যন্ত্রে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার শুরু হওয়ার পর ১৯১০ সালের ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে জেলাকর্তৃপক্ষের পূর্ব-অনুমতির আওতায় আনা হলো। ভ্রাম্যমাণ এবং অস্থায়ী প্রদর্শন-সংস্থাগুলির জন্যেও জারী হলো নিয়ন্ত্রণ আইন। ১৯১৩ সালে রাজ্যস্তরে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হলো দুটি মারাত্মক অস্ত্র: কোনো অনুষ্ঠানের সাতদিন আগে থেকে সে বিষয়ে যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহের অধিকার, এবং 'বিশৃঙ্খলার সহায়ক হতে পারে' এমন যে-কোনো প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা।

তবে এসবই ছিলো বহু আগে প্রণীত ফৌজদারী বিচার এবং দণ্ডবিধির বিশেষ প্রয়োগ। এইরকম বিশেষ প্রয়োগের এক নিদর্শন হিসেবে ১৯১১ সালের দিল্লী দরবারকে কেন্দ্র করে হীরালাল সেন-এর তৈরি একটি প্রামাণ্যচিত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল 'রাজনৈতিক' কারণে।—কেবলমাত্র সিনেমা নিয়েই বিশদ একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা সরকারী মহলে অনুভূত হচ্ছিল এই সময়ে। এই উপলব্ধির একটি রাজনৈতিক পটভূমিও অবশ্য ছিলো।

১৯০৯ সালে প্রবর্তিত মর্লি-মিণ্টো সংস্কার আইনটি ভারতীয়দের খুশি করতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৯১৮) আবার দাবি উঠল শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের। ১৯১৬ সালে বালগঙ্গাধর টিলক এবং অ্যানি বেসাণ্ট দুটি আলাদা স্বরাজ পরিষদ বা হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করে আয়ার্ল্যাণ্ডের হোমরুল আন্দোলনের

অনুসরণে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছিলেন। স্বায়ত্তশাসন আর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি দুটি আরো জোরদার হলো ওই বছরই লখ্‌নউ-এর কংগ্রেস-মুসলীম লীগ যৌথ অধিবেশনে। ১৯১৭ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ-স্বরাজ বা স্বাধীনতার প্রস্তাব নেওয়া হলো। এছাড়া বিশ শতকের প্রথম পনের বছর বাংলা, বোম্বাই এবং পাঞ্জাব প্রদেশের তীব্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রশাসনকে বিব্রত রেখেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধেও গড়ে উঠছিল প্রবল জনমত। আর সেই জনমতকে উৎসাহ দিতেই যেন ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব জন্ম দিলো এক উজ্জ্বল বিকল্পের।—এইসব রাজনৈতিক চাপের মুখে ভারতীয়দের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার নীতিগত স্বীকৃতি পেলো ভারতসচিব মিঃ এডউইন মণ্টাগু-র ঘোষণায় (২০ আগস্ট ১৯১৭)।

কিন্তু প্রশাসনের এই সাময়িক পশ্চাদপসরণের কোনো 'কুপ্রভাব' যাতে সিনেমার পর্দায় না পড়ে, তার জন্যে সরকার ছিলেন বদ্ধ-পরিকর। লণ্ডন এবং দিল্লীর মধ্যে সরকারী পর্যায়ে নিয়মিত বার্তা-বিনিময় হতো এব্যাপারে। বেসরকারী বা আধা-সরকারী পর্যায়েও আলোচনা কিছু কম হতো না এবিষয়ে। ১৯১৪ সালে হাউস অব কমন্স-এর সদস্য জনৈক মিঃ কার-গোম মাদ্রাজে প্রদর্শিত একটি আমেরিকান ছবির বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তির কথা জানালেন। পাশ্চাত্যের মহিলাসমাজ এবং সেখানকার মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছু ব্যঙ্গোক্তি নাকি ছিলো এই ছবিতে। মিঃ কার-গোম-এর আশঙ্কা, এর ফলে ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে।

বোঝাই যায়, ভারতে একটি চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে মিঃ কার-গোম-এর এই ওকালতি। খোদ ইংল্যাণ্ডে ততদিনে চালু হয়ে গেছে চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণের নানা ব্যবস্থা। ১৯১০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়েছে সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯০৯। চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর জন্যে স্থানীয় প্রশাসনের প্রাক্-অনুমতির ব্যবস্থা

চালু হয়েছে সেদেশের প্রায় প্রতিটি কাউন্টিতে। এবং ১৯১২ সালের ৭ নভেম্বর প্রতিষ্ঠা হয়েছে বৃটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সার্স্-এর। এটি কোনো সরকারী সংস্থা নয়। তবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের (হোম অফিস) প্রচ্ছন্ন অনুমোদন অবশ্যই ছিলো এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায়। ভারতে এই ব্যবস্থারই প্রসার চেয়েছিলেন মিঃ কার-গোম। মাননীয় সদস্যের এতো উদ্বেগের খুব একটা কারণ ছিলো না বোধহয়। পরিস্থিতির ওপর 'সজাগ' এবং 'সতর্ক দৃষ্টি'-ই রেখেছিলেন স্থানীয় প্রশাসন। খোদ বৃটিশ সরকারও আরো খানিকটা সময় নিচ্ছিলেন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে সংহত এবং কার্যকর করতে।

বৃটিশ বোর্ড-এর দ্বিতীয় সভাপতি মিঃ টি. পি. ও'কনর-এর তত্ত্বাবধানে, ১৯১৬ সালে, রচিত হলো তেতাল্লিশটি নিষেধবিধি।[১] এগুলির মধ্যে অর্ধেকই ছিলো প্রচলিত সুনীতি এবং ধর্ম-বিষয়ক। কিন্তু তারই সঙ্গে ছিলো আরো কিছু নিষেধবিধি: বিতর্কিত রাজনীতির উল্লেখ, পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের উল্লেখ, প্রতিষ্ঠিত জননেতা ও সংগঠন বিষয়ে নিন্দা বা ব্যঙ্গোক্তি, রাজা বা রাষ্ট্রের অবমাননা, বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং সেই সাম্রাজ্যের অধিপতি ও রক্ষকদের বিষয়ে মর্যাদাহানিকর কোনো ইঙ্গিত, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ যৌন-সম্পর্ক, শ্বেতাঙ্গ চরিত্রের নগ্নতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলার সহায়ক কোনো ঘটনার উল্লেখ—এইসব।

শ্বেতাঙ্গ জাতিদম্ভ, ঔপনিবেশিক মানসিকতা এবং বুর্জোয়া আধিপত্যবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ মিঃ ও'কনর-এর এই 'তেতাল্লিশ বিধি'। এছাড়া অবশ্য উপায়ও ছিলো না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিক্ষোভে উত্তাল জনমতকে বশে রাখতে করতেই হয়েছিল এই আয়োজন। রাশ আলগা করলে সেই জনমত একদিন হয়তো উপনিবেশের প্রসারেই বাধা দেবে, এই ভয় তখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে বৃটিশ প্রশাসনের মনে। তাঁরা বুঝেছিলেন, চলচ্চিত্রের চরিত্রেরাই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করবে যে কোনো

দিন। সেইসব সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার কৌশল তাই ভাবতেই হয়েছে প্রশাসনকে। তৎপরতার পরবর্তী পর্যায়টি শুরু হলো সাম্রাজ্যের বৃহত্তম উপনিবেশ, ভারতে।

১৯১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আইনপ্রণয়ন পরিষদ বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এ ইণ্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ বিলটি উত্থাপন করে ভারতের গভর্নর জেনারেল-এর স্বরাষ্ট্রবিষয়ের উপদেষ্টা স্যর উইলিয়াম ভিনসেন্ট মন্তব্য করলেন—

'এই বিশেষ ধরনের প্রদর্শনীর কথা মনে রেখে পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যদেশই দৃশ্যগ্রাহ্য প্রমোদমাধ্যম সংক্রান্ত আইনগুলির সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে বাধ্য হয়েছে। দুটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে—(ক) দর্শকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, এবং (খ) আপত্তিকর ছবি যাতে দেখানো না হয়, তার ব্যবস্থা করা। কুরুচিপূর্ণ বা অনভিপ্রেত ছবি অথবা সেইসব ছবি যেগুলি ধর্মীয় বা জাতিগত অনুভূতি-চেতনায় আঘাত করতে পারে, সেগুলির বিষয়ে সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। যুদ্ধের ব্যাপারে প্রশাসনকে ব্যস্ত থাকতে না হলে, বিলটি অনেক আগেই পরিষদে উত্থাপিত হতো।'

এইভাবে সরকারী উদ্বেগের ব্যাপারটি পেলো প্রকাশ্য স্বীকৃতি। এই প্রসঙ্গেই আরো জানা গেলো, ১৮৭৬ সালে প্রণীত নাট্য-অভিনয় আইনকে সংশোধন এবং সম্প্রসারণ করে সিনেমাকেও তার আওতায় আনা যায় কিনা, একথাও ভাবা হয়েছিল একসময়। সেই ভাবনাকে কাজে পরিণত না করার যুক্তি হিসেবে বলা হলো—

'(১৮৭৬-এর) এই আইন সেন্সারশিপ-এর কিছু ক্ষমতা সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে, এটা ঠিক। কিন্তু এতে দর্শকের নিরাপত্তার জন্যে কোনো ব্যবস্থাগ্রহণের কথা বলা

নেই। আধুনিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে আইনটিকে সংশোধন করতে হলে এটিকে আপাদমস্তক পরিবর্তন করতে হতো।' (৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭)

যুক্তিটি অত্যন্ত কূটচিন্তাপ্রসূত। যে 'কিছু ক্ষমতা'-র কথা ওপরে বলা হয়েছে, তার মধ্যে ছিলো এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অভিনয়ের আগেই নিষেধাজ্ঞা জারী করারও ক্ষমতা। কিন্তু সিনেমার বেলায় প্রশাসন চাইলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। চলচ্চিত্র-মাধ্যমটির বিশেষ চরিত্র তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। একটি ছবির একাধিক প্রিণ্ট একই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হয়। ফলে এক বিপুল সংখ্যক দর্শক একই সঙ্গে একটি ছবি দেখে উদ্বোধিত, অনুপ্রাণিত হতে পারে। এইটে ঠেকাতেই সরকার চাইলেন ব্যাপক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা, প্রাক্-নিষেধাজ্ঞা (প্রি-সেন্সারশিপ) হবে যার কেন্দ্রবিন্দু। এককথায়, সিনেমা এবং থিয়েটার বিষয়ে দুটি আলাদা প্রতিক্রিয়া ছিলো সরকারী মহলে। স্যর ভিনসেণ্ট-এর মন্তব্য এরই সরল স্বীকৃতি।

আইনপ্রণয়ন পরিষদের বৃটিশ সদস্যরা সরকার-পক্ষের যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। বিলটির বিরুদ্ধে সামান্য কিছু আপত্তি এসেছিল ভারতীয় সদস্যদের কাছ থেকে। জনৈক শ্রীআয়েঙ্গার মন্তব্য করেছিলেন—

'অনুপযুক্ত বা আপত্তিকর বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, বিল-এর কোথাও তার উল্লেখ নেই। ······প্রণীত আইনটিকে অতিরিক্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োগ করা হবে, এমন সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। নিয়ন্ত্রণ-অধিকর্তার ব্যক্তিগত অপছন্দের ভিত্তিতেই একটি ছবি নিষিদ্ধ ঘোষিত হতে পারে।' (আইন পরিষদে বিতর্ক, ৫ মার্চ ১৯১৮)

আর এক ভারতীয় সদস্য শ্রীখাপাড়ে-র মতে এই বিল ব্যক্তি-স্বাধীনতার অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিলটি নিয়ে বিতর্কের সময়ে যেটুকু উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্যে কৃতিত্ব দাবি করতে

করতে পারেন শ্রীখাপাড়ে-ই। বিলটিতে সামগ্রিক আইনের বৈধতা ছাড়া, আইনটির বিশেষ কোনো ধারা বা উপধারা অনুযায়ী জারী করা সরকারী নির্দেশের বৈধতা বিচারের অধিকার সাধারণ বিচারালয়-গুলিকে দেওয়া হয়নি। শ্রীখাপাড়ে-র মতে—

'যেখানে প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, সেখানে একমাত্র বিচারালয়গুলিই এব্যাপারে শেষ মন্তব্য করার অধিকারী, আর এটাই এতদিন ঘটেও এসেছে।' (বিতর্ক, ৫ মার্চ ১৯১৮)

শ্রীখাপাড়ে চেয়েছেন, চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও বিচারালয়ের হাতে সেই ক্ষমতা তুলে দেওয়া হোক্। কিন্তু যে-ভাষায় স্যর ভিনসেণ্ট শ্রীখাপাড়ে-র দাবি অগ্রাহ্য করেছেন, সেটি আইনের প্যাঁচ এবং কুযুক্তির এক অপূর্ব সমন্বয়। স্যর ভিনসেণ্ট বলেছেন—

'আমি যতদূর জানি, এ-ধরনের আবেদনের কোনো নজির বা পূর্ব-ইতিহাস নেই। ইংল্যাণ্ডে এরকম আবেদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া আমাদের অনেক আইনেই বিশেষ কিছু নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কেবল কর্তৃপক্ষেই ন্যস্ত আছে—যেমন, শহরে শোভাযাত্রা বিষয়ে। এসবের বিরুদ্ধেও তো সাধারণ আদালতে আবেদন জানানোর অধিকার স্বীকৃত নয়। আদালতকে যদি আমরা উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই এসব প্রশ্নের মীমাংসা করার দায়িত্ব দিই, তাহলে বিচারকদের আমরা এক অসম্ভব অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেবো। আর প্রমাণসাবুদ না আসা পর্যন্ত যদি নিষ্পত্তি মুলতুবী থাকে, তাহলে শুধু যে সময় এবং অর্থেরই চূড়ান্ত অসদ্ব্যবহার হবে, তা নয়, হবে অসুবিধেরও চূড়ান্ত।'

কার অসুবিধে, সেটা আর উল্লেখ করেননি স্যর ভিনসেণ্ট। তাঁর যুক্তির ধারাতেই তবু সেটা স্পষ্ট। আর স্পষ্ট, তাঁর অনমনীয় মনোভাবে। এবং তাঁর কৃতিত্ব এই যে, বিলটি যাতে সত্বর এবং হুবহু

অনুমোদন পায়, সেজন্যে সবরকম ব্যবস্থাই তিনি পূর্বাহ্নে করে রেখেছিলেন।

স্যর ভিনসেণ্ট-এরই অধ্যবসায়ে ১৯১৮ সালের ৬ মার্চ থেকে কার্যকর হলো ইণ্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট, যেটা ১৯১৮-র ২ নম্বর আইন।[২]

ড্রামাটিক পারফরম্যান্স বিলটি আইন পরিষদে পেশ করা হয়েছিল ১৮৭৬ সালের ২১ মার্চ। নয় মাস বিতর্কের পর সেটি সদস্যদের অনুমোদন পেয়েছিল সেই বছরের ৬ ডিসেম্বর। মধ্যবর্তী সময়ে বিলটির খুঁটিনাটি বিচার করার জন্যে এবং এব্যাপারে উত্থিত জনমত যাচাইয়ের জন্যে একটি সিলেক্ট কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। এক কথায়, সরকারের আসল উদ্দেশ্য যা-ই থাক্, তাঁরা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাটিকে এমনভাবে প্রবর্তন করেছিলেন, যাতে লোকের মনে গূঢ় অভিসন্ধির সন্দেহ না জাগে[৩]।

ইণ্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ বিলটিতে ছিলো কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ-বিধির প্রস্তাব। তবু সেটি অনুমোদিত হয়েছিল মাত্র ছয় মাসের মধ্যে (৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ থেকে ৬ মার্চ ১৯১৮)। এবং প্রথম থেকেই সরকারী তরফে তাড়াহুড়ো এবং গা-জোয়ারির ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অতিরিক্ত তৎপরতা না দেখিয়ে বোধহয় উপায়ও ছিলো না সরকারের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইওরোপ জুড়ে ব্যাহত হয়েছিল চলচ্চিত্র-নির্মাণের কাজ। সেই সুযোগে বিশ্বের বাজারে—এমনকি ভারতেও—প্রায় একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করে নিয়েছিল হলিউড-এ তৈরি আমেরিকান ছবি। আমেরিকান পরিচালকদের কোনো দায় ছিলো না ভারতীয়দের কাছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার। ফলে, বৃটিশ সরকারের পক্ষে 'অস্বস্তিকর', এমন বহু ছবিই এসে পড়তো ভারতের বাজারে। এমন একটি ছবির কথা আমরা আগেই বলেছি।

সিনেমার পৃষ্ঠপোষক বলতে তখন শহরে স্বল্পবিত্তের দল, অর্থাৎ মূলত শ্রমিকশেণী। ১ আনা-২ আনার টিকিট কেটে হল ভরাতেন তাঁরা— সেই যুগের একটা হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি সিনেমাহল-এ বিক্রী-হওয়া ৩৯৩টি টিকিটের মধ্যে ৩৫০টিই ১ আনা বা ২ আনার। এইসব লোকের কাছে যদিও প্রমোদমাধ্যম হিসেবেই মূলত সিনেমার আবেদন, তবু 'অস্বস্তিকর' ছবিগুলি তাঁদের মনে কোনো 'বিরূপ' প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে, এমন সন্দেহে সর্বদাই জর্জরিত থাকতেন সরকার। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও যে রাজনৈতিক বা সমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটেছে, তার আভাস পেয়েছিলেন তাঁরা। ১৯০৫ সালে শুরু হওয়া স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি ছোটখাটো শ্রমিক আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়েছিল তখন।

কলকাতার সংগঠন প্রিণ্টার্স ইউনিয়ন সরকারী ছাপাখানায় একমাসব্যাপী ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ১৯০৫ সালে। ওই একই বছরে পূর্ব ভারতীয় রেলপথের শ্রমিক-কর্মচারীরাও ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯০৭ সালে হয়েছিল সমস্তিপুরের রেল-কারখানার ধর্মঘট। বোম্বাইয়ের কারখানা শ্রমিকেরা এক সপ্তাহ ধর্মঘট করেছিলেন লোকমান্য টিলক-এর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৯০৮ সালে। আর ১৯০৮ সালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার-কর্মচারীদের ভারতব্যাপী ধর্মঘট।

স্বল্পস্থায়ী 'ধর্মঘটী পর্ষদ'-এর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিলো স্থায়ী শ্রমিক-সংগঠনও—যেমন বোম্বাইয়ের কামগর হিতবর্ধক সভা (১৯০৮), কলকাতা ও বোম্বাইয়ের পোস্টাল ইউনিয়ন, সর্বভারতীয় সংগঠন ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাসোসিয়েশন (১৯০৯)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বভারতীয় রাজনীতি যেমন নতুন পথে বাঁক নিলো স্বাধীনতার দাবিতে, শ্রমিক আন্দোলনেও এলো নতুন দিশা। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের অনিবার্য ফল ছিলো ব্যাপক খাদ্যাভাব এবং ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। সেই সঙ্গে ছিলো শ্রমিকদের আশু সমস্যা— চাকরিতে নিরাপত্তার অভাব এবং কর্মক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

এ-দুয়ের সম্মিলিত প্রভাবে জর্জরিত শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা দেখে শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন সমস্যার নিষ্পত্তি করা যাবে না। শ্রমিকশ্রেণী যে সমাজ-রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এই বোধ ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত। শ্রমিক-আন্দোলনকে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল করতে সচেষ্ট হলেন প্রাগ্রসর রাজনৈতিক কর্মীরা। অ্যানি বেসান্ট-এর শিষ্য বি. পি. ওয়াড়িয়া হলেন প্রথম ভারতীয় শ্রমিকনেতা, যিনি শ্রমিক আন্দোলনকে সরাসরি অন্বিত করেছিলেন রাজনীতির সঙ্গে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগঠিত হলো মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন (১৯১৮), যেটিকে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আদি সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

এইসব 'দুর্লক্ষণ' চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সেই প্রাথমিক পর্বটিকে নিঃসন্দেহে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল, অন্তত পরোক্ষভাবে।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই বৃটিশ সরকার বিভিন্ন সংযোগমাধ্যম বিষয়ে তাঁদের স্পর্শকাতরতার প্রমাণ দিতে থাকেন। এইসব মাধ্যমগুলিকে কেন্দ্র করে জনমত যাতে সংহত না হতে পারে, তার জন্যে বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে নাট্য-অভিনয় আইন (১৮৭৬), ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮), জনসভা-নিরোধ আইন (১৯০৭), সংবাদপত্র (অপরাধে প্ররোচনা) আইন (১৯০৮) এবং সবশেষে প্রেস অ্যাক্ট (১৯১০)। ভারতীয় চলচ্চিত্র আইন (১৯১৮) সেই প্রক্রিয়ারই শেষবিন্দু। তবে চরিত্রগতভাবে যেহেতু নাট্য-অভিনয় আইন এবং চলচ্চিত্র আইন-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সমগোত্রীয়, আইন দুটিকে পাশাপাশি রেখে আমরা বিচার করে দেখতে পারি।

১৮৭৬ সালের আইনে ক্ষেত্রবিশেষে অভিনয়ের আগেই নিষেধাজ্ঞা জারী করার ব্যবস্থা থাকলেও আইন-প্রয়োগে খুব একটা কড়াকড়ি

ছিলো না। নাট্য-অভিনয় বিলটি উত্থাপনের সময়েই সরকার পক্ষ থেকে আইন পরিষদের সদস্যদের এই বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, প্রস্তাবিত আইনটি নাট্য-অভিনয়ের ক্ষেত্রে স্থায়ী এবং সংগঠিত কোনো সেন্সারব্যবস্থার প্রবর্তন করবে না (উত্থাপনকারী সদস্য মিঃ এ. হবহাউজ-এর বিবৃতি, ২১ মার্চ ১৮৭৬)। সরকারের চোখে এই আইনের উদ্দেশ্য ছিলো 'প্রয়োজনানুগ নিয়ন্ত্রণ'। নাট্য-অভিনয় আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি এইরকম :

'স্থানীয় (ফৌজদারী) কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে অভিনীত বা অভিনেয় কোনো নাটক (ক) কুৎসাপূর্ণ বা নিন্দাসূচক, (খ) বৃটিশ ভারতে আইনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত যে-সরকার, তার প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক বা (গ) হীন প্রবৃত্তি আর দুর্নীতির পথনির্দেশকারী, তাহলে তাঁরা বিশেষ ঘোষণাবলে সেই নাটকের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে পারেন।' (৩ নম্বর ধারা)

'এই ঘোষণা জারী করার পরেও কোনো ব্যক্তি যদি (ক) নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানটিতে বা সেই অনুষ্ঠানের সমতুল্য কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেন, বা (খ) এই ধরনের অনুষ্ঠান-আয়োজনে কোনোভাবে সহায়তাও করেন, বা (গ) ঘোষণা-টিকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে দর্শক হিসেবেও এ-ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে (অংশবিশেষে হলেও) উপস্থিত থাকেন, অথবা (ঘ) মালিক, অধিকারী বা ব্যবহারকারী হিসেবে বাড়ি, ঘর বা জায়গাকে এ-ধরনের অনুষ্ঠানে নিজে ব্যবহার করেন বা অপরকে ব্যবহার করতে দেন, তাহলে তিনি এই আইনের সাপেক্ষে দোষী সাব্যস্ত হবেন।' (৬ নম্বর ধারা)

'অভিনেয় নাটকের চরিত্র নির্ধারণ করার জন্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেই নাটকের লেখক, স্বত্বাধিকারী বা মুদ্রক অথবা নাট্যশালার পরিচালক বা মালিকের কাছে প্রয়োজনমতো

তথ্য চেয়ে পাঠাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য থাকবেন; অন্যথায় তিনি আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হবেন।' (৭ নম্বর ধারা)

বিধিনিষেধের এত মারপ্যাঁচ থাকলেও এই আইনের কোথাও এমন কথা বলা হয়নি যে, প্রতিটি নাটকের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক অনুমোদন দরকার। ভারতীয় চলচ্চিত্র-আইন (১৯১৮) সরকারের হাতে তুলে দিলো প্রি-সেন্সারশিপের সেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। আইনের ৫ নম্বর ধার য় বলা হলো:

'কোনো ছবি সাধারণ্যে প্রদর্শনের উপযোগী, এই মর্মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না-পাওয়া পর্যন্ত কেউ সেই ছবি দেখাতে পারবেন না।'

প্রদর্শনীর পূর্বে পরীক্ষা-সাপেক্ষে অনুমোদন চাওয়ার ব্যবস্থাটি যে শুধু প্রতিটি ছবির ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক করা হলো, তা নয়। আইনের জালে জড়ানো হলো প্রদর্শককেও:

'এই আইন মোতাবেক প্রদত্ত অনুমতিপত্রে নির্দিষ্ট কোনো স্থান ব্যতীত আর কোথাও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী করা চলবে না।' (৩ নম্বর ধারা)

'এই ধরনের অনুমতিপত্র দেওয়ার অধিকারী হবেন কেবলমাত্র জেলাশাসক বা পুলিস কমিশনার।' (৪ নম্বর ধারা)

অনুরূপ কোনো বিধির উল্লেখ নাট্য-অভিনয় আইনের কোথাও পাওয়া যাবে না। তুলনীয় যে একটিমাত্র নিষেধবিধি আছে সেই আইনে, তার প্রয়োগক্ষেত্র অথবা কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ—একমাত্র কোনো জরুরী অবস্থায় এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সেটি প্রযোজ্য:

'গভর্নর-জেনারেলের অনুমতি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট একটি তারিখ থেকে অনুমোদিত প্রমোদশালা ব্যতীত অন্য যে কোনো স্থানে নাট্য-অভিনয় নিষিদ্ধ করতে পারেন। বিশেষ সেই অঞ্চলের কোনো

প্রমোদগৃহেই নাট্য-অভিনয়ের আয়োজন করা যাবে না, যদি লিখিত নাটকের অনুলিপি/প্রতিলিপি বা অভিনেয় নাটকের উদ্দেশ্য বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ একটি প্রতিবেদন অনুষ্ঠানের অন্তত তিন দিন আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া না হয়।' (১০ নম্বর ধারা)

ভারতীয় চলচ্চিত্র-আইনে প্রাপ্ত প্রি-সেন্সারশিপের ক্ষমতা সত্ত্বেও স্বস্তি হয়নি সরকারের। তুরুপের এত বড়ো তাসটি হাতে রেখেও চলচ্চিত্র-আইনে তাঁরা সংযোজিত করলেন একাধিক রক্ষাকবচ, যার মাধ্যমে প্রশাসনিক অধিকার প্রয়োগ করে সেন্সার-পর্ষদের যে-কোনো সম্ভাব্য 'ভুলত্রুটি' শুধরানোর ব্যবস্থা করা হলো। চলচ্চিত্র-আইনের ৭ নম্বর ধারার বিভিন্ন উপধারায় বিধৃত হলো এইসব প্রশাসনিক রক্ষাকবচ :

'সেন্সার-পর্ষদ যদি মনে করেন কোনো ছবি সাধারণ প্রদর্শনের অনুপযুক্ত এবং প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শক সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হন, তাহলে মধ্যস্থের ভূমিকায় আসবেন স্থানীয় প্রশাসন। তাঁদের সিদ্ধান্তই হবে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত।' (৩ নম্বর উপধারা)

'অন্য প্রদেশ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে আসা যে-কোনো ছবির প্রদর্শনী দ্বিতীয় একটি সেন্সার-পর্ষদ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে পারবেন। এরপর বিষয়টি সালিশীর জন্যে পাঠানো হবে প্রাদেশিক সরকারের কাছে। এবং এখানেও, অনিবার্য-ভাবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ন্যস্ত হলো স্থানীয় প্রশাসনের ওপর।' (৪ নম্বর উপধারা)

'কোনো প্রাদেশিক সরকার একটি প্রদেশের সর্বত্র অথবা অঞ্চলবিশেষে যে-কোনো ছবির অনুমোদন বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারেন।' (৫ নম্বর উপধারা)

'প্রশাসনিক ঘোষণার প্রাক্কালেও অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন-

বোধে একজন জেলাশাসক বা পুলিস কমিশনার অনুমোদন-পাওয়া কোনো ছবির প্রদর্শনী বিশেষ-কোনো অঞ্চলে স্থগিত রাখার আদেশ জারী করতে পারেন, অথবা সেই অঞ্চলের মধ্যে ছবিটির অনুমোদনপত্রের কার্যকারিতা সাময়িকভিত্তিতে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারেন।' (৬ নম্বর উপধারা)

পরে আমরা দেখবো, কার্যক্ষেত্রে এইসব 'রক্ষাকবচ' কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল!

আপাতত লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, নাট্য-অভিনয় আইনটি যদিও কেন্দ্রীয় প্রশাসনেরই তৈরি, তবু আইন-প্রয়োগের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তখন ন্যস্ত হয়েছিল প্রাদেশিক সরকারগুলির ওপর। বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কোনো বিশেষ ভূমিকা এক্ষেত্রে ছিলো না। চলচ্চিত্র-আইনে কিন্তু আইন-প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণের মূল ক্ষমতাটি দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের হাতে। কোনো ছবি দেখানো হবে কি না, সেই বিচারের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ভার ছিলো গভর্নর-জেনারেলের ওপর। চলচ্চিত্র-আইনের ৭ নম্বর ধারার ১ নম্বর উপধারায় বলা ছিলো :

'গেজেট-বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে গভর্নর-জেনারেল ছবি পরীক্ষা এবং অনুমোদনের জন্যে কয়েকটি পর্ষদ নিয়োগ করবেন। কতগুলি পর্ষদ গঠন করা হবে, সেই সংখ্যাটি গভর্নর-জেনারেলই নির্দিষ্ট করে দেবেন—প্রয়োজন অনুসারে। কোনো একটি পর্ষদের অনুমোদনপত্র বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট অঞ্চলে গ্রাহ্য হবে।'

'দর্শক-নিরাপত্তা'-র মতো গৌণ ব্যাপারটিই—যার মূল লক্ষ্য সিনেমাহলে দর্শকদের সুযোগ-সুবিধে সুনিশ্চিত করা—কেবল স্থানীয় ফৌজদারী কর্তৃপক্ষের আওতায় রাখা হলো।

১৯১৯ সালে প্রণীত মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইনের ফলে কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলো। বিভিন্ন

রাজনৈতিক চাপের মুখে কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে বজ্রমুষ্টি শিথিল করার লোক-দেখানো ভানও করতে হলো। তথাকথিত উদারনীতির প্রমাণ হিসেবে প্রণীত হলো সিনেম্যাটোগ্রাফ (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) অ্যাক্ট ১৯১৯, সেবছরের ২৩ নম্বর আইন। এই আইনে সেন্সার-পর্ষদ গঠনের ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের কাছ থেকে স্থানান্তরিত হলো প্রাদেশিক রাজ্যপালের হাতে। উল্লেখ করার মতো বিষয় এই যে, ১৯১৯ সালেই প্রণীত হয়েছিল কুখ্যাত রাওলাট আইন, যাতে ভারতীয় প্রজাদের যথেচ্ছ শাস্তি দেওয়া, নির্বাসনে পাঠানো, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা প্রভৃতি বিধানের ব্যবস্থা ছিলো।

এরপর ১৯২০ সালে এলো ডিভল্যুশন অ্যাক্ট, অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তর/বিকেন্দ্রীকরণ আইন, সে-বছরের ২৮ নম্বর আইন। চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের ওপর কেন্দ্রীয় প্রশাসন তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে এবারে ব্যবস্থা নিলেন এইরকম: সেন্সারশিপের ব্যাপারটি প্রাদেশিক রাজ্যপালের হাতে গেলো 'সংরক্ষিত বিষয়' হিসেবে, আর কোনো ছবির প্রদর্শনযোগ্যতা সম্পর্কে অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে আইন প্রণয়নের পূর্ণ অধিকার থাকলো কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের হাতে। আইনের এত মারপ্যাঁচের ফল দাঁড়ালো এই যে, নিয়ন্ত্রণের মূল যে-কাঠামোটি নির্দিষ্ট ছিলো ১৯১৮ সালের চলচ্চিত্র-আইনে, তাতে আসলে কোনো পরিবর্তনই এলো না। কারণ, 'সংরক্ষিত' বিষয়গুলি সংবিধান অনুসারে ছিলো প্রাদেশিক রাজ্যপালের প্রত্যক্ষ এক্তিয়ারে। রাজ্যস্থিত আইন-পরিষদের কোনো বক্তব্যই এক্ষেত্রে গ্রাহ্য ছিলো না। আর, প্রাদেশিক রাজ্যপালের নিয়োগকর্তা যেহেতু কেন্দ্রীয় প্রশাসন, ফলে নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিটা যে আদতে তাঁদেরই হাতে থেকে গেলো, একথা বুঝতে খুব-একটা কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এভাবেই সম্পূর্ণ হলো নবীনতম সংযোগমাধ্যমটিকে শৃঙ্খলিত করার প্রাথমিক আয়োজন। লক্ষণীয়, এ পর্যন্ত প্রশাসন প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলেছেন অত্যন্ত সতর্কভাবে অথচ প্রয়োজনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

৩. অধিকারের প্রকারভেদ

বৃটেন-প্রবর্তিত সেন্সারব্যবস্থার তুলনা এই প্রসঙ্গে অনিবার্য হয়ে ওঠে—কেন না, মনে হতে পারে বৃটিশদের প্রবর্তিত ভারতীয় সেন্সার-ব্যবস্থার কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল বৃটিশ সেন্সারব্যবস্থারই আদলে। অথচ খুব একটা মৌলিক পার্থক্য ছিলো এ-দুয়ের মধ্যে।

বৃটেনে সেন্সারব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় প্রাথমিক উদ্যোগটা যদিও ছিলো সে দেশের সরকারের, বৃটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সারস্ গঠনের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে ছিলেন প্রদর্শক-সংগঠন, সিনেম্যাটোগ্রাফিক এগজিবিটরস্ অ্যাসোসিয়েশন। বৃটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই বোর্ড-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন, এই যা। তবে প্রথম কয়েকবছর সংগঠনটির কাজকর্মের পেছনে প্রত্যক্ষ কোনো প্রশাসনিক সমর্থন ছিলো না। অঞ্চল-ভিত্তিক অনুমোদন আধিকারিকগুলিই (County Licensing Authority) ছবির প্রদর্শনীর ব্যাপারে খবরদারী করতেন। এমনও অনেক সময় হয়েছে যে, বোর্ড-অনুমোদিত ছবিকে বিশেষ কোনো কাউন্টি কাউন্সিল ছাড়পত্র দেন নি।

এখানে বলা দরকার, ১৯০৯ সালের সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট-এর সঙ্গে বৃটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সারস্-এর কোনো সম্পর্কই ছিলো না। সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট কেবল দর্শক-নিরাপত্তার কথা ভেবেই তৈরি। সিনেমার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরকারের মনোভাব যা-ই থাক্, তা নিয়ে কোনোরকম বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা ভাবেন নি তাঁরা। ফলে, চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো উল্লেখই নেই ওই আইনে।

বৃটেন-এর রক্ষণশীল সমাজ অবশ্য এতখানি ধৈর্যের পরিচয় দেন নি। চলচ্চিত্রকে 'জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী' বলে আক্রমণ

চালিয়েছেন তাঁরা এই মাধ্যমটির বিপক্ষে। আক্রমণে যে তীব্রতা ছিলো খুবই, তার প্রমাণ সেদেশের 'চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতি'-র এক প্রতিবেদন :

'সমাজে প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধের স্বনিযুক্ত অভিভাবকেরা এখন আর সিনেমাহলগুলিকে তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ভাবছেন না। তাঁদের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন যে পরিমাণ উপেক্ষা এবং ঘৃণার সম্মুখীন হয়, তাতে তাঁরা ক্লান্ত-বিধ্বস্ত। এখন তাঁরা বরং উঠে-পড়ে লেগেছেন যাতে মাথার ওপরে একজন ফিল্ম-সেন্সারকে বসানো যায়—সমস্ত ছবিকে বাজারে আনার আগে অনুমোদনের জন্যে তাঁর কাছে পাঠাতে হবে।.... এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে সেন্সার যদি নিয়োগ করতেই হয়, তাহলে ইণ্ডাস্ট্রিরই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। অন্য যে কোনো কর্তৃপক্ষের দয়ার ওপর সমস্ত ছবির ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভালো ব্যাপারে হবে।'

('বায়োস্কোপ' পত্রিকা, ৮ জানুয়ারী ১৯১২)

রক্ষণশীল চলচ্চিত্র-বিরোধিতা নিয়ে বিদ্রূপ করলেও, চলচ্চিত্র-বিরোধী সমস্ত বক্তব্যই অন্তঃসারশূন্য একথাও সরাসরি বলতে পারেন নি প্রতিবেদক। সংযমের খাতিরে একটা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করছেন। কিন্তু সরকারী বিধিনিষেধের কাছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমূলে বিসর্জন দেওয়াও তাঁর অভিপ্রেত নয়—তিনি বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতিনিধি! ঐতিহাসিক কারণেই মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ তথা অধিকারের মধ্যেই পড়ে। ১৬৮৮ সালের 'বিল অব রাইট্স্' তাঁর কাছে স্মরণীয় ঐতিহ্য, যাতে বলা আছে যে সংসদের বাইরে অন্য কোনো জায়গায়, এমনকি আদালতেও, বাক্-স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না ; খণ্ডন করা তো যাবেই না।

সেই ঐতিহ্যেরই ধারাবাহিকতায় বৃটিশ সরকারও কোনো স্থায়ী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হতে দ্বিধা করেছেন। 'চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতি' ১৯১২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী তাঁদের চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রস্তাবে সরকারী অনুমোদন প্রার্থনা করে দরবার করেছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ম্যাকেনা-র কাছে। কিন্তু মিঃ ম্যাকেনা তাঁদের সাফ জানিয়ে দেন :

'কোনো বিষয়ে ছবি তৈরি হবে কিনা বা তৈরি হওয়ার পর তা দেখানো যাবে কিনা, এ বিষয়ে বিধান দেওয়ার দায়িত্ব নিতে আমি রাজি নই। আমাব অফিস যদি সে-দায়িত্ব নেয়, তাহলে আপনারা ঝাড়া হাত-পা হয়ে যাবেন এবং কোনো আপত্তিকর প্রদর্শনী নিয়ে আপনাদের আর কিছু বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে সংসদ-অধিবেশনে এমন বিতর্কের সৃষ্টি হবে যে সবকিছুই আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে।'

চতুর স্বরাষ্ট্র সচিব আসলে সমস্যাটিকে উল্টো করে তুলে ধরেছেন। 'অনুমোদিত' ছবি নিয়ে তত আইনগত বা আদর্শগত সমস্যা দেখা দিতো না, যত সমস্যা দেখা দিতো 'অননুমোদিত' ছবির ক্ষেত্রে। আঠের শতকেই মোটামুটি স্থির হয়ে গিয়েছিল যে, মতপ্রকাশের পরে বিশেষ কোনো মতাবলম্বীকে 'আইনানুগ' শাস্তি দেওয়া প্রশাসনিক অধিকারের সীমান্তেই পড়ে; কিন্তু মতপ্রকাশের আগে পরোক্ষ প্রমাণ, সন্দেহ বা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি দেওয়া তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং তা সমর্থনের অযোগ্য। সে সময়কার একজন আইনবিদ লিখছেন :

'প্রাক্-নিষেধাজ্ঞার যে কোনো রূপই জনগণের মুক্ত চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। প্রকাশিত কোনো মতের ভিত্তিতে কেউ শাস্তি পেলেও সেটা তার মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবে না। বরং স্বাধীনতার অপব্যবহার করে,

সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর এবং আইনে নিষেধ আছে, এমন কিছু প্রকাশের স্পর্ধা যদি কেউ দেখায়, তাহলে শাস্তিই তার প্রাপ্য। যথেচ্ছাচারের প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ায় যে শাস্তি, তা বরং বাক্-স্বাধীনতাকে রক্ষাই করে।'[১]

কোনো প্রাক্-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাই (pre-censorship) যে মতাদর্শগত ঐতিহ্যের মানদণ্ডে যুক্তিগ্রাহ্য হবে না, একথা বুঝে গিয়েছিলেন বৃটিশ প্রশাসন। এ ব্যাপারে আইনের বিচারে তাঁদের যে খুব একটা অসুবিধেয় পড়তে হতো, তা অবশ্য নয়। বৃটিশ আইনে সংসদের প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। সংসদের যে কোনো আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতাও সে দেশে স্বীকৃত। ১৬৮৮-র 'বিল অব রাইট্‌স্' ছাড়া লিখিত কোনো সংবিধানে যখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি সেদেশে, তখন এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করার প্রত্যক্ষ আইনগত কোনো অসুবিধেও ছিলো না। কিন্তু সেই আইন সংসদের অনুমোদন পাবে কিনা, সেই বিষয়টি ছিলো অনিশ্চিত। ফলে প্রশাসন জোর দিয়েছিলেন অভ্যন্তরীণ স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণের ওপর। সেই সরকারী ইচ্ছের সম্মানেই 'চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতি' স্থাপন করলেন বৃটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সারস্। বেসরকারী উদ্যোগ বলে এর প্রক্রিয়ার সম্পর্কে কিছুদিন একটা অনিশ্চয়তা ছিলো। বৃটেন-এর বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন কাউন্টি কাউন্সিল এই সেন্সার-ব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত সংশয়ের মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েই থাকলো। একসময় অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছিল যে সরকার সেন্সারব্যবস্থাকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছিলেন ১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে।

কিন্তু বৃটেন-এ সেন্সারব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ১৯১৭ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে সরকার পরিচালিত 'জনসাধারণের নীতিবোধ রক্ষার্থ জাতীয় পর্ষদ' তাঁদের এক বিশেষ

প্রতিবেদনে বেসরকারী এই সেন্সারব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংশয়ের মেঘ কাটতে শুরু করলো তখন থেকেই। ১৯১৭ সালেই সেন্সার বোর্ড-এর দ্বিতীয় সভাপতি হলেন মিঃ টি. পি. ও'কনর। তিনি ছিলেন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন প্রশাসক। তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং কর্মকুশলতার ফলে বোর্ড দেশব্যাপী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জন করলো।— আইনকে পাস কাটিয়ে এভাবেই সংগঠিত হয়েছে বৃটিশ সেন্সারব্যবস্থা।[২]

সব সময়েই যে বৃটিশ বোর্ড সরকারী নীতির দ্বারা সরাসরি চালিত হয়েছেন, এমন বলা যাবে না। তবে সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বোর্ড মোটামুটি সম্মান দিয়েছেন। এহেন আধা-সরকারী সেন্সার-ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়েই বৃটেন-এর কোনো স্বরাষ্ট্র সচিব একবার বলেছিলেন :

> 'একথা স্বীকার করতে আমার কোনোই দ্বিধা নেই যে একটা অদ্ভুত ব্যবস্থাকে ভালোভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বৃটিশদের একটা বিশেষ দক্ষতা আছে—এবং এক্ষেত্রেও সেই দক্ষতারই প্রমাণ পাওয়া যায়।'[৩]

ভারতে সেন্সারব্যবস্থা প্রবর্তনের সময়ে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা অবশ্য 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' বা 'বাক্-স্বাধীনতা'-র মতো তুচ্ছ বিষয়গুলিকে আমল দেন নি। শাসকের ঐতিহ্য তো আর শোষিতের জন্যে নয়। বিশেষ করে যখন শাসকেরা আলোক-বিতরণের এক মহান ব্রত নিয়ে উপনিবেশের শাসনভার তুলে নিয়েছিলেন নিজেদের কাঁধে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যত 'সংবিধান' বা 'শাসনতান্ত্রিক আইন' প্রবর্তিত হয়েছে এদেশে, সেগুলির একটিতেও 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' বা 'বাক্-স্বাধীনতা' স্বীকৃতি পায় নি। তা সত্ত্বেও মুদ্রণ বা নাট্যাভিনয়ের ওপর সরাসরি প্রাক্-নিয়ন্ত্রণ জারী করেন নি বৃটিশ প্রশাসন, এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন হারানোর ভয়ে। বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষে ভারতে শিক্ষিতের হার ছিলো জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশেরও কম।

প্রশাসনের প্রয়োজনে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই হাতে রাখা দরকার ছিলো বৃটিশ কর্তৃপক্ষের। বিভিন্ন মুদ্রণ আইন বা নাট্যাভিনয় আইন নিয়ে আলোচনায় এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বারবার ১৬৮৮ সালের বৃটিশ 'বিল অব রাইট্‌স্', ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের সময় ঘোষিত মানবাধিকার সনদ বা ১৭৯১ সালের আমেরিকান 'বিল অব রাইট্‌স্'-এর কথা তুলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন। এই আক্রমণের মুখে কিছুটা 'নমনীয়তা' দেখিয়েছেন বৃটিশ শাসকেরা।

অবশ্য মুদ্রণনির্ভর সংযোগমাধ্যম (পুস্তক-সংবাদপত্র) বা নাট্য-অভিনয়ের সমাযোজনক্ষমতা সীমিত। একটি বা দুটি বই, সংবাদপত্র বা অভিনয়ের সূত্রে 'আপত্তিকর' বক্তব্য এমনকিছু ব্যাপক পাঠক-দর্শকমহলে পৌঁছতে পারে না। ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে তো যে কোনো মুহূর্তেই জারী করা যেতো নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথাই প্রাথমিকভাবে ভাবতে হয়েছে সরকারকে। মুদ্রণ বা নাট্য-অভিনয়ের পৃষ্ঠপোষক বলতে তখন বিদ্বৎসমাজ এবং ধনীসম্প্রদায়। 'প্রেস' এবং 'থিয়েটার' নামক পাশ্চাত্য মাধ্যমগুলিকে তাঁরা তখন সবেমাত্র আত্মস্থ করেছেন। নিজেদের সদ্য-অর্জিত রাজনৈতিক চেতনার বাহন হিসেবে সেগুলিকে ব্যবহার করতেও শুরু করেছেন তাঁরা। মারাঠী, বাংলা এবং তামিল নাটকে তখন দেশপ্রেমের জোয়ার। প্রাক্-অভিনয় নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা এইসব নাটকের কর্ণধারেরা সহজে মেনে নিতেন না—বাংলা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে প্রতিক্রিয়া হতো মারাত্মক। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক-সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও এই তিনটি প্রদেশই ছিলো অগ্রণী; আর ছিলো পাঞ্জাব প্রদেশের উর্দু সাহিত্য। ১৯১৭-১৮ সালের আন্তর্জাতিক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে উপনিবেশে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজন ছিলো নানা কারণেই। বিশেষত প্রয়োজন ছিলো ধনী এবং বিদ্বান সমাজের সহযোগিতা। প্রেস এবং থিয়েটারের জন্যে তাই থাকলো শর্ত-

সাপেক্ষ নিয়ন্ত্রণ।

চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণে সেই ভয়টা ছিলো না। ভারত সরকার বুঝেছিলেন, সিনেমা সম্পর্কে কঠোরতম আইন প্রণয়ন করলেও এব্যাপারে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে সামান্যই। সামাজিক-রাজনৈতিক মর্যাদার বিচারে তখনো সাহিত্য বা নাটকের সমগোত্রীয় হয়নি চলচ্চিত্র। সেই প্রথম যুগে সিনেমা ছিলো নিছক 'ম্যাজিক' আর এই 'ম্যাজিক'-এর যাঁরা পৃষ্ঠপোষক, তাঁরাও তখন বিত্ত, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডে বেশ নীচুতলারই লোক। সিনেমার মূল পরিচিতি তখন 'ছোটলোকের আমোদ' হিসেবে। ১৯২৭-২৮ সালেও শহরবাসী কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন, তিনি সিনেমা দেখেন না, কারণ দর্শকদের পঁচাত্তর শতাংশই নিরক্ষর এবং নিম্নশ্রেণীর। জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ হলেও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই 'ছোটলোক'-দের সম্মিলিত প্রভাব ছিলো প্রায় শূন্যের কোঠায়। আর রাজনীতির বিচারে হিসেব করে যে ঝুঁকিটা ছাপাখানা বা থিয়েটারের ক্ষেত্রে নিতে পারতেন সরকার—ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যালকুলেটেড রিস্ক—সিনেমার ক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি নেওয়া তাঁদের অভিপ্রায় ছিলো না।

সরকারকে আশ্বস্ত করতেই যেন সিনেম্যাটোগ্রাফ বিল নিয়ে আলোচনার সময় 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' বা 'বাক্-স্বাধীনতা'-র প্রসঙ্গগুলি বিরোধীদের আলোচনাতেও বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। বুর্জোয়া-আদর্শের পরিপন্থী একটি প্রাক্-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে তাই এতটুকুও অস্বস্তিতে পড়েন নি বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের দল।

এখানে বলে নেওয়া ভালো, স্যার ভিনসেণ্ট যে বড়োমুখে বলেছিলেন 'পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যদেশেই সিনেমা-সম্পর্কিত বিশেষ আইন বলবৎ হয়েছে', তা-ও সত্যের অপলাপ! ভারতের আগে আইন করে সেন্সারব্যবস্থা চালু হয়েছে মাত্র চারটি দেশে—ফ্রান্স-এ, ডেনমার্ক-এ, নরওয়ে-তে এবং সুইডেন-এ। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার তিনটি

দেশে সেন্সারব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিলো কোমলমতি, অপাপবিদ্ধ শিশু-কিশোরদের মনকে সিনেমার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। ভারতীয় সেন্সারব্যবস্থার অলিখিত বা ঘোষিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে এসবের কোনো তুলনাই হয় না। ফ্রান্স-এ সেন্সার-ব্যবস্থার সূত্রপাত অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে দেশে যাতে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি না পায়, আসন্ন যুদ্ধপ্রস্তুতি যাতে আইনশৃঙ্খলাহীনতা বা উত্তেজনার কারণে ব্যাহত-ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তামন্ত্রকের উদ্যোগে সে দেশে সেন্সারব্যবস্থার প্রবর্তন। সিনেমার পর্দায় অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রতিফলন বন্ধ করাই ছিলো এর মুখ্য উদ্দেশ্য। চতুর্থ দশকে (১৯৩০-১৯৩৯) অবশ্য এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কিন্তু আপাতত আমাদের তুলনামূলক আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর। আমাদের বলার কথা এই যে, উল্লিখিত চারটি দেশ ছাড়া ১৯১৭-১৮ সালের আগে পৃথিবীর কোথাও চলচ্চিত্রের ওপর প্রাক্-নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় নি। বৃটেন-কে কেন আমরা হিসেবের বাইরে রেখেছি, তার কারণ তো বিস্তারিত বলেছি।

৪· আয়োজনের প্রেক্ষাপট

ভারতীয় চলচ্চিত্র-আইন প্রয়োগের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করতে খুব বেশি সময় নেন নি প্রশাসন। কারণ ১৯১৮ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে বৃটিশ সরকারের পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। সংশোধিত ভারতরক্ষা আইন (রাওলাট আইন) এবং মন্টাগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন ভারতের জনসাধারণ। এবারে আর বিক্ষিপ্ত, অসংগঠিত প্রতিবাদ নয়, জন-অসন্তোষ সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেছে সত্যাগ্রহ আন্দোলন; আলী ভাইদের উদ্যোগে চলছে খিলাফৎ আন্দোলন। বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক-অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেছে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের কর্মসূচীতে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ের কাপড়-কারখানায় শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘটে এর সূত্রপাত। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো ১৯২০ সালে, বোম্বাইয়ের সমস্ত কাপড়-কারখানায় শ্রমিকদের একমাস ব্যাপী ধর্মঘটে। একই সময়ে কানপুর-এর উল-কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট, কলকাতা অঞ্চলের পাটশিল্পে শ্রমিক-ধর্মঘট, বোম্বাইয়ের রেল-শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং আমেদাবাদ ও শোলাপুর-এর সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রশাসনকে বিব্রত করেছে। শিল্প-নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার চেষ্টাও তখন চলছে পুরোদমে। এসবেরই প্রতিক্রিয়ায় কঠোর হয়েছে বৃটিশের দমননীতিও—এর চরম বিন্দু অমৃতসর-এর জালিয়ানওয়ালা-বাগে নারকীয় গণহত্যা (২৩ এপ্রিল ১৯১৯)।

দেশের বাইরেও এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে তখন, যার ফলে বৃটিশ

প্রশাসনের আশঙ্কাই বেড়েছে শুধু, যদিও সেইসব ঘটনার ওপর প্রত্যক্ষ কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না তাঁদের। সশস্ত্র বিপ্লবপন্থার অনুগামীরা অনেকেই বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন ১৯১৫ সালের পর—কেউ কেউ আমেরিকায়, কেউ জাপানে, অধিকাংশই জার্মানীতে। তাঁদের প্রচারপুস্তিকা আসতো এদেশে, গোপনে। প্রচারপুস্তিকায় থাকতো ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি। ১৯১৮-১৯ সালেই আবার ভীষণ তোড়জোড় চলেছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের। ১৯১৮ সালে খায়রি ভাইয়েরা এবং ১৯১৯ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদল যে মস্কোতে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, এখবরও যথাসময়ে পৌঁছেছে বৃটিশ প্রশাসনের কাছে। এই ঘটনা-প্রবাহের চাপ উপেক্ষা করবেন, এ ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিলো না প্রশাসনের। ১৯২০ সালের মে মাসে চারটি চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদ নিযুক্ত হলো বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং রেঙ্গুন, এই চারটি বন্দর-শহরে।

বোম্বাইতে পর্ষদের সদস্যসংখ্যা হলো ছ-জন। সদস্য ছিলেন এঁরা :

১) শহরের পুলিস কমিশনার, পদাধিকারবলে পর্ষদের সভাপতি ; ২) বন্দরের কাস্টম্‌স্ কালেক্টার ; ৩) ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিস-এর একজন সদস্য ; ৪) সুপরিচিত কোনো হিন্দু নাগরিক ; ৫) সুপরিচিত কোনো মুসলিম নাগরিক এবং ৬) সুপরিচিত পার্সী নাগরিক।

বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক সরকার নিযুক্ত এই পর্ষদের দৈনন্দিন কাজের দায়িত্বে ছিলেন একজন সচিব এবং একজন পরিদর্শক। ছবি দেখে মন্তব্যসহ প্রাথমিক প্রতিবেদন তৈরি করার দায়িত্ব ছিলো এঁদেরই যে-কোনো একজনের ওপর। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পর্ষদের সভায় ছবির ছাড়পত্র পাওয়া না-পাওয়ার ব্যাপারটি স্থির

হতো। প্রয়োজন মনে করলে পর্ষদ-সদস্যরাও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে ছবি দেখে নিতেন।

কলকাতা পর্ষদে নিযুক্ত হয়েছিলেন আটজন সদস্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন :

১) পুলিস কমিশনার, পদাধিকারবলে পর্ষদ-সভাপতি; ২) স্টেশন স্টাফ অফিসার (অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি); ৩) শহরবাসী একজন ইউরোপীয় মহিলা; ৪) বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর একজন প্রতিনিধি; ৫) ক্যালকাটা ট্রেড্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন-এর একজন প্রতিনিধি; ৬) শিক্ষাবিভাগে কর্মরত একজন মুসলিম প্রতিনিধি; ৭) শহরবাসী একজন ইহুদি বণিক; আর ৮) কলকাতা পুরসভার পক্ষে একজন হিন্দু আইনজীবী।

শহরের ডেপুটি পুলিস কমিশনার হলেন পদাধিকারবলে পর্ষদের সচিব। পরিদর্শক ছিলেন দুজন—একজন ভারতীয়, একজন ইওরোপীয়। ছাড়পত্র বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিটা বোম্বাইতে যেমন ছিলো, কলকাতায়ও ছিলো একইরকম।

মাদ্রাজে নিযুক্ত পর্ষদের সভ্য-নির্বাচনে এতটা কড়াকড়ি ছিলো না। বোম্বাই এবং কলকাতার মতো এখানেও অবশ্য শহরের পুলিস কমিশনারই পদাধিকারবলে পর্ষদ-সভাপতি হতেন। বাকি পাঁচজন সদস্যের মধ্যে অন্ততপক্ষে একজন সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি এবং একজন মুসলিম প্রতিনিধি হলেই চলতো। সচিব বা পরিদর্শক নিয়োগের কোনো ব্যবস্থা এখানে ছিলো না। পর্ষদ-সভাপতি নিজে অথবা তাঁর মনোনীত অন্য যে কোনো একজন সদস্যের সুপারিশেই ছবির ছাড়পত্র পাওয়া না-পাওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হতো।

রেঙ্গুন পর্ষদেও শহরের পুলিশ কমিশনার ছিলেন পদাধিকারবলে পর্ষদ-সভাপতি। বাকি সাতজন সদস্যের মধ্যে শহরের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার ছিলেন পদাধিকারবলে পর্ষদ-সচিব, সামরিক

বাহিনীর একজন প্রতিনিধি, একজন ইওরোপীয় ডাক্তার এবং অন্য চারজন স্থানীয় নাগরিক, যাঁদের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন মহিলা। ছবি পরীক্ষার দায়িত্বে থাকতেন কমপক্ষে দুজন পর্ষদ-সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সাব-কমিটি। এই কমিটি নির্বাচন করতেন পর্ষদ-সভাপতি।

চারটি মাত্র বন্দর-শহরেই কেন সেন্সার-পর্ষদ নিযুক্ত হলো এবং অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানী বা শহরে কেন এরকম কোনো পর্ষদ গঠিত হলো না, তার একটা কারণ বোঝা যাবে নিচের চিঠিটি থেকে। চিঠিটি বিহার-উড়িষ্যা সরকারের মুখ্যসচিব মিঃ এইচ. ম্যাকফার্‌সন লিখেছিলেন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে। মিঃ ম্যাকফার্‌সন-এর বক্তব্য :

'কলকাতার কিছু কোম্পানী মাঝে-মধ্যে প্রদেশের দু-একটি শহরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। এছাড়া চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যাপারটি বিহার-উড়িষ্যায় প্রায় অজ্ঞাতই বলা যায়। (প্রাদেশিক) রাজ্যপাল তাই মনে করেন, এ-ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে সাহায্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রধান প্রধান বন্দর-শহরগুলিতে নিযুক্ত (সেন্সার) পর্ষদের অনুমোদনপত্র গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।' (২০ জুন ১৯১৮)

তাছাড়া প্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিলো যেহেতু মূলেই 'আপত্তিকর' ছবির কণ্ঠরোধ করা, তাই ছবি আমদানী বা তৈরি করার প্রধান কেন্দ্রগুলিকেই শুধু নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। অহেতুক অন্যান্য শহরে সেন্সার-পর্ষদ গঠন করে খরচ বাড়ানোর কোনো ইচ্ছে তাঁদের ছিলো না।

কালক্রমে অবশ্য পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর শহরটি উত্তরভারতে ছবি তৈরির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এবং ১৯২৭ সালে সেখানেও একটি সেন্সার-পর্ষদ গঠিত হয়। পাঁচ সদস্যের এই পর্ষদের সবচেয়ে

ক্ষমতাবান ব্যক্তিটি ছিলেন প্রাদেশিক গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা, যিনি পদাধিকারবলেই হলেন পর্ষদ-সচিব।

সেন্সার বিধিগুলি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তো বটেই, প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রথম থেকেই তাহলে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ব্যাপারটি প্রকট হয়ে গেলো—সবকিছুই যদিও হয়েছে 'পুরোপুরি আইন মেনে'। নিয়ন্ত্রণবিধির কাঠামোতেই সরকারী হস্তক্ষেপের পথ পরিষ্কার করা ছিলো। লক্ষ্য করার বিষয়, সেন্সার-পর্ষদগুলিতেও অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ সদস্য ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। সুতরাং পর্ষদ-গুলির কাজকর্মে যে সরকারী নীতিরই ছায়াপাত ঘটবে, তা অনুমান করতে খুব একটা কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

তথাকথিত একটি প্রমোদমাধ্যম বিষয়েই সরকারের এতখানি সতর্কতা! এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, প্রশাসন কোন্ চোখে দেখেছিলেন চলচ্চিত্রকে।

বৃটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সারস্-এর অনুকরণে বোম্বাইয়ের সেন্সারপর্ষদ ছবির পরীক্ষকদের সুবিধার্থে এগারোটি 'সাধারণ নীতি' প্রণয়ন করলেন ১৯২০ সালেই। এখানে এগারো নম্বর ধারায় মোট বিয়াল্লিশটি আপত্তিকর বিষয়ের উল্লেখ ছিলো, যেগুলি মিঃ ও'কনর-এর 'তেতাল্লিশ বিধি'-র প্রায় হুবহু নকল।

ভারতীয় সেন্সারব্যবস্থার ইতিহাসে বোম্বাই পর্ষদের এইসব 'সাধারণ নীতি' খুবই উল্লেখযোগ্য। পরাধীন ভারতে এটাই ছিলো সেন্সারবিধির ব্যাপকতম রূপরেখা। কলকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন বা লাহোর-এর পর্ষদগুলি এইসব নীতির ভিত্তিতেই কাজ করতেন। সুতরাং 'নীতি'গুলো এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে:[১]

ক) ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে অনমনীয়ভাবে এবং ব্যতিক্রম-হীন প্রয়োগ করা চলে, এমন সেন্সারবিধি প্রণয়ন করা এককথায় অসম্ভব।

খ) বিধিনিষেধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করা

বাঞ্ছনীয় ; তবে সবসময়েই যে একটা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে আসা যাবেই এমন না-ও হতে পারে।

গ) প্রতিটি ছবিকে যাচাই করতে হবে সেটির নিজস্ব যোগ্যতারই নিরিখে।

ঘ) সততার সঙ্গে এবং নিরপেক্ষভাবে ছবি বিচার করার পর যদি পরিদর্শকের মনে হয় যে সেই ছবি সমগ্র দর্শককূল বা তার একাংশেরও ক্ষতিসাধন করতে পারে, তাহলে সেই ছবিকে অনুমোদন দেওয়া যাবে না।

ঙ) আপত্তিকর বলে বিবেচিত হবে সেইসব ছবি :

১) অপরাধের গুরুত্বকে যেগুলি লঘু করে দেখায় অথবা অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে অল্পবয়সীদের এমনভাবে পরিচয় ঘটায়, যাতে তারা এই সিদ্ধান্তে আসে যে চুরি, ডাকাতি বা হিংসাত্মক অপরাধের প্রবণতা সাধারণ জীবন-যাপনেরই অঙ্গ এবং এটিকে নিন্দা করারও কিছু নেই, অথবা যেগুলি চুরি-ডাকাতির বিস্তারিত চিত্রায়ণ করে বা অপরাধের পদ্ধতিকে ছবির মূল বিষয় করে ;

২) অনৈতিক কাজকর্মকে যেগুলি আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করে, অথবা নীতিহীন মানুষদের মাননীয় বা সাফল্যমণ্ডিত হিসেবে দেখায় ; অথবা একথা বোঝায় যে দুর্দিনে বা দুর্বিপাকে পড়ার পর কেউ যদি প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয় তাহলে তাকে নীতিভ্রষ্ট বলা যায় না ; অথবা যেসব ছবি বিবাহপদ্ধতির অবমাননা করে, অস্বাভাবিক যৌন-সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়, বা পারিবারিক বন্ধনের পবিত্রতা বিষয়ে কটাক্ষ করে ;

৩) অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ বা (শিশু ছাড়া) মানব-মানবীর বিবস্ত্র অবস্থার চিত্রায়ণ করে যেসব ছবি, অথবা বিবস্ত্র মূর্তির ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিমার চিত্রায়ণ করে ;

৪) মহারাজার উর্দি-পরা সৈনিক, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদুত, বিচারক, পুলিস, ধর্মীয় যাজক, সরকারী কর্মচারী—এদের অপমান করে যেসব ছবি ;

৫) বিদেশী রাষ্ট্র বা কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুভূতিতে যেগুলি আঘাত করে ;

৬) সামাজিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে পারে যেসব ছবির সূত্রে—অর্থাৎ যেসব ছবি দুঃসহ সামাজিক অবস্থার চিত্রায়ণেই শুধু নয়, পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বে যে-হিংসার উদ্ভব হয় তার চিত্রায়ণেও তৎপর ;

৭) যে ছবিগুলি সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে অথবা আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে।

(চ) ভারতীয় জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ যেখানে অশিক্ষিত এবং যেদেশে এমন বহু মানুষের বাস যারা পরিণত বিবেচনা প্রয়োগে (mature judgement) অক্ষম, সেখানে কোনো ছবি গড়পড়তা ভারতীয় দর্শকের মনে কী প্রভাব ফেলবে, সেকথা চিন্তা করতে হবে পরিদর্শককে।

(ছ) পরীক্ষকদের একথা মনে রাখা উচিত যে একটি ছবিতে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকর কিছু না থাকলেও সেটি বিপজ্জনক হতে পারে যদি ছবির উৎস-সাহিত্যটি হয় খারাপ ; আবার যে-সাহিত্যে ক্ষতিকর কোনো উপাদানই নেই, তার চিত্র-রূপটিও হতে পারে বিপজ্জনক।

(জ) প্রেমের সন্ধানে (এমনকি সে-প্রেম যদি অন্যায়-অবৈধও হয়) যে ব্যবহারদোষ ঘটে আর যে ব্যবহারদোষ লাম্পট্যপ্রসূত, এ-দুয়ের মধ্যে যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে, সেকথা পরীক্ষকদের মনে রাখতে হবে।

(ঝ) ১) কাহিনীমূলক বা বর্ণনাত্মক টাইট্ল বা সাব-টাইট্ল-এর পরিবর্তন বা পরিমার্জনে বা ২) ছবির অংশ-

বিশেষের পরিবর্জনে অথবা ৩) এ-দুয়েরই সমন্বয়ে—পর্ষদ ছবি সম্পর্কে তাঁদের আপত্তির কারণগুলি দূর করতে পারেন।

(ঞ) দুজন পরিদর্শক, অথবা পর্ষদ-সচিব এবং কোনো-একজন পরিদর্শক ছবি পরীক্ষার সময় উপস্থিত থাকবেন।

(ট) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছবির ক্ষেত্রে আপত্তিকর বলে গণ্য হবে :

১) অশালীন, অস্পষ্ট বা অসম্মানসূচক টাইট্‌ল / সাব-টাইট্‌ল।
২) পবিত্র বিষয়ের সম্মানহানিকর কিছুর চিত্রায়ণ।
৩) কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার মূর্ত রূপায়ণ।
৪) অত্যধিক আবেগপূর্ণ কোনো প্রেমদৃশ্য।
৫) অশালীন যৌনদৃশ্য।
৬) অনৈতিক ইঙ্গিতবাহী দৃশ্য।
৭) একই শয্যায় শায়িত নারী-পুরুষ।
৮) অস্বাভাবিক দাম্পত্য-সম্পর্ক।
৯) প্রথম সহবাস-রাত্রি।
১০) প্রসবকালীন অবস্থা।
১১) বালিকাদের বিপথে চালিত করার দৃশ্য।
১২) শ্বেতাঙ্গ দাসব্যবসায়।
১৩) বেশ্যালয়।
১৪) দেহব্যবসায় এবং সেই উদ্দেশ্যে মহিলা-সংগ্রহ।
১৫) জন্মগত বা আহরিত যৌনরোগের প্রভাব-সমন্বিত দৃশ্য।
১৬) অবৈধ যৌন-সম্পর্ক।
১৭) অজাচারমূলক (incestuous) সম্পর্কের ইঙ্গিত।
১৮) সমবেত বা জাতিগত আত্মহত্যা।
১৯) মহিলাদের শ্লীলতাহানির দৃশ্য।
২০) বিবস্ত্র শরীর।

২১) মহিলাদের অন্তর্বাসের অহেতুক প্রদর্শনী।
২২) শালীনতার সীমা লঙ্ঘনকারী স্নান দৃশ্য।
২৩) অশালীন নৃত্য।
২৪) আহত করার মতো অশিষ্টাচার, অসংবৃত বেশভূষা বা অশালীন ব্যবহার।
২৫) প্রকাশ্যে অশালীন জিনিসপত্রের ব্যবহার।
২৬) শিশু নির্যাতন বা নারী নির্যাতন।
২৭) পশু নির্যাতন।
২৮) বীভৎস হত্যা এবং শ্বাসরোধ দৃশ্য।
২৯) ফাঁসীর দৃশ্য।
৩০) অপরাধীর কার্যকলাপ।
৩১) পানশালার সুদীর্ঘ দৃশ্য।
৩২) গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদির নেশা।
৩৩) বিতর্কিত রাজনীতির উল্লেখ।
৩৪) পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব।
৩৫) সুপরিচিত ব্যক্তি এবং রাজনীতির অবমাননা।
৩৬) রাজবেশধারী ব্যক্তির অবমাননা, তাঁকে উপহাস।
৩৭) ভারত-সম্পর্কিত চিত্রায়ণে বৃটিশ বা ভারতীয় রাজকর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণ হিসেবে দেখানো; দেশীয় রাজ্যগুলির বিরুদ্ধাচরণ অথবা অন্য কোনোভাবে সাম্রাজ্যে বৃটিশ মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী দৃশ্য।
৩৮) অত্যধিক রক্তপাতের দৃশ্য।
৩৯) যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎসতা।
৪০) দৃশ্য বা ঘটনাবলীর এমন উপস্থাপনা যাতে যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ কোনো গুপ্ত তথ্য জেনে ফেলে।
৪১) যুদ্ধকালীন যেসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে, তার সুযোগ গ্রহণ করা।

৪২) অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে অপমানজনক বা অস্বস্তিকর ঘটনা।

অতিরিক্ত যে একটিমাত্র ধারা ছিলো মিঃ ও'কনর-এর 'তেতাল্লিশ বিধি'-তে, সেটি হলো 'তুঁতে প্রয়োগের প্রভাব'।

কলকাতার সেন্সার-পর্ষদ বোম্বাই পর্ষদ প্রণীত এইসব বিধিনিষেধ দ্বারাই মূলত চালিত ছিলো, কিন্তু তাছাড়াও এদের ছিলো একটি সংক্ষিপ্ত আচরণবিধি—মাদ্রাজ, রেঙ্গুন বা লাহোর-এ যা ছিলো না। কলকাতার সেন্সার কর্তারা সেন্সারপ্রথার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে চারটি সাধারণ নীতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন :

১) নৈতিক অবক্ষয়-রোধ।

২) ধর্মীয় বিশ্বাসের সংরক্ষণ।

৩) রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা-রোধ।

৪) জাতিগত বৈষম্যের তত্ত্ব-প্রচারে বাধাদান।

এইসব সাধারণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে, এমন আটটি সাধারণ বিষয়ও আবার তাঁরা নথিবদ্ধ করলেন, ছবিতে যেগুলির উল্লেখ খুবই আপত্তিকর বলে বিবেচিত হতে পারে :

১) ধর্ষণ, ২) নাবালিকাদের বিপথে চালনা করা, ৩) দেহব্যবসায়, ৪) বিবস্ত্রা নারী, ৫) নেশাগ্রস্ত নারী, ৬) ক্যাবারে অনুষ্ঠান, ৭) ধর্মীয় স্থানের অবমাননা, এবং ৮) শ্বেতাঙ্গ-কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ-নির্যাতন অথবা কৃষ্ণাঙ্গ-কর্তৃক শ্বেতাঙ্গ-নির্যাতন।

বলা বাহুল্য, বিধিনিষেধের এই ব্যাপক রূপরেখা ভারতীয় ছবির কথা ভেবে তৈরি করা হয় নি। ১৯১৯-২০ সালে যেসব ছবি ভারতে তৈরি হতো সেগুলি সংখ্যায়ও যেমন ছিলো কম, বিষয়ের দিক থেকেও ছিলো নিরীহ—অধিকাংশই ইতিহাস বা পুরাণ-আশ্রয়ী, বাকীগুলি সাধারণ সামাজিক নাটক। শ'য়ে শ'য়ে যে আমেরিকান ছবি আসতো এদেশে, সেগুলো নিয়েই ছিলো সরকারের চিন্তা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে—যা আসলে দুটি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে

বাজার দখলের লড়াই—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা জয়ী হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই জয়ের জন্যে ব্যাপক ক্ষতির মাশুল গুণতে হয়েছিল তাঁদের। এরপর ক্লান্ত, পর্যুদস্ত বৃটিশ শক্তি সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে বাধ্য হয়ে দুটি পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। প্রথমটি রাজনৈতিক : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বা স্থিতাবস্থা-বিরোধী যে কোনো বক্তব্যের কণ্ঠরোধে হলো এর প্রকাশ। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আরো সূক্ষ্ম এবং অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী। এর প্রয়োগ হয়েছিল পাশ্চাত্য-জাতিগুলির 'স্বাভাবিক গরিমা' প্রচারে। সিনেমার পর্দায় বৃটিশ সরকার তাঁদের এই দুই উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

অথচ তখনো পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ছোট শরিক আমেরিকার রাজনৈতিক মূল্যবোধে 'উদারনীতি'-র একটা জায়গা ছিলো। ছবির পর্দায় কখনো যে তার প্রতিফলন হতো না, এমনও নয়। আবার, আমেরিকান সমাজের নৈতিক মানদণ্ডটিও বৃটিশ সমাজের নৈতিক মানদণ্ডের তুলনায় বেশ শিথিল ছিলো। সেই শৈথিল্যের প্রকাশ হতো আমেরিকার ছবিতেও। এই দুটি ব্যাপারই ছিলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনভিপ্রেত, কেননা সেগুলি তাঁদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কিন্তু আমেরিকান ছবির ওপর সরাসরি বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ জারী করারও কোনো উপায় ছিলো না, অর্থনৈতিক কারণেই। খোদ বৃটেন-এ তখন চরম রুগ্নতার মধ্যে দিয়ে চলেছে চলচ্চিত্রশিল্প। ভারতীয় প্রদর্শনক্ষেত্রের বিপুল চাহিদার আংশিক পূরণও সম্ভব ছিলো না সেই সূত্রে। সম্ভব ছিলো না ভারতীয় সূত্রেও। বাধ্য হয়েই বৃটিশ প্রশাসনকে যেতে হলো বিষয়-নিয়ন্ত্রণ তথা পরিশোধনের রাস্তায়।

১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বোম্বাই, কলকাতা এবং মাদ্রাজ-এর সেন্সার-পর্ষদগুলিতে পরীক্ষিত ছবির বিন্যাসটি এইরকম :[২]

বছর	ভারতীয় ছবির সংখ্যা	আমদানী-করা ছবির সংখ্যা*	মোট ছবি	ভারতীয় ছবির শতকরা অংশ
১৯২১-২২	৬৩	৬১৫	৬৭৮	৯.২৯
১৯২২-২৩	৭০	৬৫৩	৭২৩	৯.৬৮
১৯২৩-২৪	৬৩	৫৮০	৬৪৩	৯.৮০
১৯২৪-২৫	৭০	৬৮৫	৭৫৫	৯.২৭
১৯২৫-২৬	১১১	৬২৬	৭৩৭	১৫.০৬
১৯২৬-২৭	১০৮	৭৭৫	৮৮৩	১২.১৩

*এখানে আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করা ছবির সংখ্যাই দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে শুধু এটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট হবে যে, সে সময়ে ভারতে যত বিদেশী ছবি দেখানো হতো, তার মধ্যে আশি শতাংশই ছিলো আমেরিকায় তৈরি।

ভারতে সেন্সার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উৎসাহে বৃটিশ প্রশাসন সব সময়েই যে বাস্তব-অবস্থাভিত্তিক বিবেচনা আর সিদ্ধান্তের দ্বারা চালিত হয়েছেন, এমন অবশ্য নয়। জোর দিয়ে হয়তো একথাই বলা যায় যে, তাঁরা প্রত্যক্ষ সমস্যার সম্মুখীন যত না হয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশি করে অনুভব করেছিলেন কিছু পরোক্ষ চাপ। ঘটনাপ্রবাহের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের চেয়ে তাঁরা বেশি নির্ভর করেছেন অনুমান, সন্দেহ আর আশঙ্কার ওপর। এসব ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার মাত্রা যতখানি তীব্র আর ব্যাপক হতে পারে, ঠিক ততখানি তীব্র আর ব্যাপক হয়েছে প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া। ভিক্টোরীয় নৈতিকতা আর রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার বিরোধী বক্তব্যকে যতভাবে সম্ভব রোধ করার আয়োজন করেছেন তাঁরা। বহু হাস্যকর খুঁটিনাটির বিষয়েই প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের স্পর্শকাতরতা। 'বিয়াল্লিশ বিধি'-র মধ্যে বহুবার তাই দেখা যাবে পুনরাবৃত্তি, ভাষার রকমফেরে প্রায় একই

নিষেধের দ্বিরুক্তি—আইনের ফাঁক গলে কিছুতেই যাতে 'আপত্তিকর' বিষয়গুলি জনসমক্ষে না আসতে পারে।

কোনো ঝুঁকি নিতে চান নি প্রশাসন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, কীভাবে সোভিয়েত বিপ্লবের কর্ণধারেরা ধীরে ধীরে সেদেশের চলচ্চিত্রকে বিপ্লবী শাসনপরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে-ছিলেন। ১৯১৯ সালে ১৭ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে চলচ্চিত্র-শিল্প এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মকাণ্ডের জাতীয়করণ হলো। লেনিন ঘোষণা করলেন :

> 'নিছক জমকালো কিছু ছবির চেয়ে ভালো কিছু দেখার যোগ্যতা আমাদের শ্রমিক এবং কৃষকদের আছে। সত্যিকার মহৎ শিল্পের রসাস্বাদনের অধিকার অর্জন করেছেন তাঁরা। সেই ধরনের শিল্পসৃষ্টির জন্যে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই কিছু গুরুদায়িত্বের ভার নিতে হবে। এব্যাপারে যখন তাঁরা সচেতন হবেন এবং তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব তাঁরা পালন করবেন সুষ্ঠুভাবে, তখনই সর্বহারা বিপ্লবের প্রতি তাঁদের ঋণ পরিশোধ হবে।'[৩]

ঠিক তখনই ভারতে সোভিয়েত ছবি এসে পড়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না অবশ্য। তবু সরকার প্রস্তুত থাকলেন।

আর যে-আমেরিকার ছবির প্রায় একাধিপত্য তখন এদেশে, এবং যেদেশের ছবি নিয়ে সরকারের অস্বস্তি ছিলো সবচেয়ে বেশি, সেখানেও অবস্থাটা বদলাচ্ছিল তখন। 'উদারনীতি'-র জায়গাটা দ্রুত দখল করছিল 'দমননীতি'।

১৯১৯ সালে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন আমেরিকান প্রশাসন। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন-এর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে দেশব্যাপী নিপীড়নের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মিঃ এ. মিচেল পামার। চারিদিকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন 'বিপ্লবের লেলিহান শিখা'! ১৯২০ সালের ১ জানুয়ারী

দেশজুড়ে বামপন্থী সংগঠনগুলির দপ্তর তছনছ করে দেওয়ার নির্দেশ এলো জাতীয় পুলিসবাহিনীর (Federal Police) কাছে। ছ' হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হলো।

অন্যদিকে সরকার পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজ-সংস্কারের বদলে ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের কত বেশি সুযোগ-সুবিধে দেওয়া যায়, সেই হিসেব নিয়েই তখন ব্যস্ত ছিলেন।

> 'সারা দশক জুড়ে মুনাফা বেড়েছে আশি শতাংশ হারে। উৎপাদনবৃদ্ধির তখন যে-হার, এটা ছিলো তার প্রায় দ্বিগুণ। অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিতে তো লাভের হার ছিলো চম্‌কে দেওয়ারই মতো, প্রায় দেড়শো শতাংশ। সময় যত এগিয়েছে, শেয়ার বাজার তত বেশি করে শুষে নিয়েছে যান্ত্রিক দক্ষতার অনাহরিত ফসল অর্থাৎ লভ্যাংশ।...অথচ জনগণের হাতে তখন ক্রয়ক্ষমতার এমন কিছু প্রাচুর্য ছিলো না, যাতে তাঁরা বর্ধিত উৎপাদনের সুফল ভোগ করতে পারেন।'[৪]

সরকারী মহলে তখন ধারণাটা ছিলো এইরকম :

> 'সরকার হলো নিছক ব্যবসা। বাণিজ্যিক নীতির ভিত্তিতেই একে চালানো যায় এবং তা-ই চালানো উচিত।'[৫]

অথচ পৃথিবীর কোনো-কোনো জায়গায় এই ধারণার বিপরীত আদর্শও তো বাস্তবায়িত হচ্ছে তখন। ফলে আমেরিকান সরকারকে বাঁকা রাস্তাও ধরতে হলো।

> "আমেরিকানরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রায় সমস্ত অধিকারই বিসর্জন দিলেন 'পৃথিবীকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করা'-র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। পেশাদার সংস্কারক এবং মতান্ধদের সামনে জাতীয় সরকার নানা আকর্ষণীয় পথ খুলে দিলেন। এঁদের পূর্বপুরুষেরা 'ডাইনী' পুড়িয়ে মারার নির্দোষ আমোদে মত্ত থাকতেন একসময়; সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর

নিজেদের জাহির করার সুযোগ বোধহয় এ-ধরনের মানুষদের সামনে আর আসে নি। যুদ্ধের উন্মাদনা প্রশমিত হওয়ার পর এইসব কট্টর দেশপ্রেমীদের সামনে দুটিমাত্র বিকল্প ছিলো—হয় নতুন নতুন প্রয়াসে নিয়োজিত হওয়া, নয়তো নিজেদের গৌরব এবং প্রাপ্তির সুযোগগুলি বিসর্জন দেওয়া।"[৬]

রাশিয়ার অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে আমেরিকার সরকার জনসংযোগমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত লোকজনদের কাছে বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে নামার আহ্বান রাখলেন। চলচ্চিত্রকারদের কাছে বিশেষ যে-দাবিটা ছিলো, সেটা এইরকম: কীভাবে আমেরিকায় প্রচলিত সমাজব্যবস্থাতেই গরীবরাও বড়োলোক হয় এবং নাগরিকেরা পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তার চিত্রায়ণ থাকুক অধিকাংশ ছবিতে। সেদেশের চলচ্চিত্রকারেরা অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন সরকারের এই আবদার।

কিন্তু প্রতিবাদী স্বরও যে ছিলো না, এমন নয়।

চ্যাপলিন ছিলেন তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়ে। তাঁর তৈরি সেই ক্ষুদে ভবঘুরে চরিত্র—হতদরিদ্র যার বেশবাস, হাস্যকর আচার-আচরণ সত্ত্বেও যার ছিলো আভিজাত্যের ভান, তীব্র স্বাধিকারবোধ, মতলব হাসিল করার অন্তহীন প্রয়াস, তাকে নিয়ে অনেক আপাত-মজার মধ্যেই চ্যাপলিন এনে দিতেন সামাজিক বৈষম্যের ব্যঞ্জনা। ছবির পর ছবিতে তিনি দেখাতেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কীভাবে 'ক্ষুদে ভবঘুরে'টি সমাজের নানা মেকি মূল্যবোধকে আশ্রয় করে নিজেকে জাতে তোলার দুরন্ত কসরতে মসগুল আছে। করুণরস আর ব্যঙ্গরসের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে চ্যাপলিনের ছবি। নিজের ছেলেবেলায় বস্তীবাসের সমস্ত অভিজ্ঞতা—মালিন্য, ক্লিন্নতায় যা ভরপুর—তিনি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন ছবিতে। কটাক্ষ করেছেন সেই সমাজকে, যেখানে, তাঁরই কথামতো, প্রতি দশজনের মধ্যে নজনই গরীব। ব্যঙ্গ করেছেন

বৈষম্যমূলক সামাজিক মূল্যবোধ আর নৈতিক বিধিকে, জাতিগত বিদ্বেষকে, ধর্মান্ধতাকে, ঠুনকো আভিজাত্য-বোধকে, ঔদ্ধত্য, শঠতা, মিথ্যা ভড়ং-কে। ঠিক যে-যে সামাজিক ব্যাধির প্রকাশ্য রূপায়ণ বন্ধ করতে চাইছিলেন আমেরিকার সরকার, সেইসব ব্যাধির চিত্রায়ণের মধ্যে দিয়েই চ্যাপলিন শাণিত করেছেন তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। দেখিয়েছেন, কীভাবে আমেরিকায় পদদলিত হচ্ছে ন্যূনতম মানবিকতার আদর্শগুলি।

আমেরিকার গণতন্ত্রী সরকারের প্রবর্তিত রাজনৈতিক নীতি ও মূল্যবোধকে পরোক্ষে আক্রমণ করেছেন ম্যাক সেনেট-ও, কমেডিয়ান হিসেবে যিনি চ্যাপলিন-এর পূর্বসূরী। চ্যাপলিন-এর সূক্ষ্ম কারুকাজ সেনেট-এর ছবিতে পাওয়া যাবে না। তুমুল হুল্লোড়, হট্টগোল আর বিশৃঙ্খলায় সেগুলির শুরু এবং শেষ। সেনেট সম্পর্কে বিখ্যাত আমেরিকান সমালোচক রেমণ্ড ডুরন্যাঁ লিখেছিলেন একবার:

> 'সেনেট-এর নাম করলেই মনে পড়ে যায় এক গতির উন্মাদনা—নির্বিচার ভাঙচুরের প্রলয়ঙ্কর উন্মত্ততা; মুখোমুখি দৌড়ে-আসা দুটো গাড়ির মাঝখানে পড়ে-যাওয়ার ভয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ছিটকে পড়া পুলিসের দল; দুরন্তগতিতে ছুটে আসা ট্রেনের সামনে লেভেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়া অসহায় মানুষ। সবকিছুই মনে হবে দুঃস্বপ্ন, আর পৃথিবীটা, উন্মাদের আখড়া।'[৭]

—এসবের মধ্যে দিয়ে একটিমাত্র লক্ষ্যেই সেনেট স্থির রেখেছেন তাঁর আক্রমণের সূচীমুখ—স্বাধীন ব্যবসায় (free enterprise)।

কমেডির সেই স্বর্ণযুগের আর-এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হ্যারল্ড লয়েড-ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে যন্ত্রনির্ভর শহুরে মানসিকতার অমানবিক, অন্তঃসারশূন্য চেহারাটা ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

অবশ্য কেবল কমেডিয়ানরাই যে ক্ষতিকর সামাজিক-অর্থনৈতিক মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে শিল্পকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তা নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকায় সামাজিক বিক্ষোভ এবং রক্ষণশীলদের বাগাড়ম্বর যে একটা জটিল আবহাওয়ার জন্ম দিয়েছিল, তার অশুভ প্রভাব সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন এমন আরো-অনেক চলচ্চিত্রকার, শিল্পের ইতিহাসে যাঁরা প্রথম সারিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ, নিজের ছবি 'বার্থ অব আ নেশন'-এ (১৯১৫) যিনি স্পষ্টতই কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষের পরিচয় রেখেছিলেন, ফিরে এলেন পরমত-সহিষ্ণুতা আর উদারনীতির বাণী নিয়ে তাঁর 'ইনটলারেন্স' ছবিতে (১৯১৬)। অন্তহীন অর্থগৃধ্নুতা, মুনাফার লোভ এবং সামাজিক বৈষম্যের অনিবার্য ফলই যে যুদ্ধ. সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন গ্রিফিথ। বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধাচরণ তিনি করলেন তাঁর নিজস্ব শৈলীতে। সরাসরি প্রতিবাদ বা ব্যঙ্গের পথে তিনি যাননি। কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকারের বাইরেও যে সুস্থ চিন্তা আর উদার মনোবৃত্তির একটা উজ্জ্বল পরিমণ্ডল আছে, যেখানে প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা আর সহানুভূতির অগ্রাধিকার, একথাই ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তাঁর ছবিতে।

হলিউড-এর আর এক দীপ্ত ব্যক্তিত্ব সিসিল বি. ডি'মিল-ও বিভেদপন্থা, হিংসাত্মক মনোভাব আর যুদ্ধবৃত্তি বিষয়ে নিজের বিতৃষ্ণার কথা উচ্চারণ করেছেন ছবিতে। বলা হয় :

> 'মহাযুদ্ধ ডি'মিল-এর মনে জন্ম দিয়েছিল এক দ্বৈত অনুভূতির —যুদ্ধসৃষ্ট সমাজের শিথিল নৈতিকতার সঙ্গেও তিনি যেমন একাত্মবোধ করতেন, তেমনি একাত্মবোধ করতেন এই বিশ্বাসেরও সঙ্গে যে, যুদ্ধ হলো ইওরোপের পূর্বকৃত পাপের ভগবদ্দত্ত শাস্তি। তাঁর বিশ্বাস ছিলো প্রায়শ্চিত্তের অনিবার্যতায়....'।[৮]

চ্যাপলিন, গ্রিফিথ আর ডি'মিল ছিলেন হলিউড-এর উজ্জ্বলতম তিন নক্ষত্র। কিন্তু আরো অনেক চলচ্চিত্রকারই তখন সেখানে কাজ

করতেন, যাঁরা সামাজিক অন্যায়ের বিভিন্ন উদাহরণ, মানবিকতা-লঙ্ঘনের বিভিন্ন অধ্যায় চিত্রায়িত করেছেন সযত্নে। জাগ্রত করতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের বিবেককে ; উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন শুভবুদ্ধির মানুষদের। টমাস্ ইন্‌কে, রেক্স ইন্‌গ্রাম, এরিক ফন স্ট্রহেইম ছিলেন এমন মানুষ। অ্যাডল্‌ফ জুকর, উইলিয়ম র‍্যান্‌ডল্‌ফ্ হার্স্ট, লুই বি. মেয়ার, স্যামুয়েল গোল্ডউইন, আর্‌ভিন থ্যালবার্গ—এঁদের হাত ধরে হলিউড যখন প্রায় অন্ধের মতো মুনাফাবৃত্তির শিখর ছোঁওয়ার চেষ্টায় রত, চ্যাপলিন-গ্রিফিথ-ডি'মিল-ইন্‌কে-ইন্‌গ্রাম-স্ট্রহেইম-এর দল তখন চেষ্টা করেছেন সমাজের স্বরূপটা দর্শকদের চিনিয়ে দিতে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা ক্ষতগুলির বিশ্লেষণ করতে। নীতিবাগীশ রক্ষণশীলদের দল এঁদেরই নিবৃত্ত করতে ফিল্ম সেন্সারশিপ প্রবর্তনের দাবি তুলেছিলেন সেদেশে। 'জুৎসই' কিছু অজুহাত খাড়া করতে অবশ্য ভোলেন নি তাঁরা।[১]

আমেরিকার এইসব ঘটনার কোনো প্রভাবই কি ভারতে জায়মান সেন্সারব্যবস্থার ওপর পড়েনি ? পড়েছিল যে, লণ্ডন-এর 'ওয়েস্ট-মিনস্টার গেজেট'-এর একটি প্রবন্ধ তারই পরোক্ষ স্বীকৃতি :

'আমাদের সম্পর্কে ভারতীয়দের প্রায় প্রকাশ্য ঘৃণার একটা বড়ো কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে ভারতে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব এবং তার বিকাশের ধারার মধ্যে। ইংল্যাণ্ডের একজন গড়-পড়তা সিনেমা-দর্শক সাধারণত দেখেন মোটামুটি উত্তেজনাময় একটা নাটক যেখানে স্পষ্টতই কারো নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে, নয়তো, রোমাঞ্চকর অথচ অবাস্তব কোনো কাউবয় ছবি। আমাদের সেই আশ্চর্য রসবোধ, যার প্রকাশ ঘটে নিরপরাধ মানুষের গায়ে চার্লি চ্যাপলিন-এর সোডার জল ছিটিয়ে দেওয়ায় অথবা অসংখ্য জানালার শার্সি ভাঙার কৌতুকে, তা-ও উপভোগ করার (অথবা না-করার) সুযোগ তিনি পান।

এবার প্রাচ্যবাসীদের মনে এসবের প্রতিক্রিয়ার কথা একটু বিবেচনা করা যাক। ভারতীয়রাও সিনেমা দেখতে যায়, আমাদের মতো। কিন্তু ছবির গল্পই তো তাকে টানে না, তাকে আকৃষ্ট করে পোশাক, রীতি আর নীতিবোধের সুস্পষ্ট পার্থক্যগুলিও। ছবিতে সে আমাদের মেয়েদের দেখে স্বল্প-পোশাকে। আমাদের মোটাদাগের, বালখিল্যসুলভ কৌতুকে অবাক হয় সে—তার রসবোধ অনেক উন্নত এবং তা আরো বেশি করে বুদ্ধিগত স্তরের ব্যাপার। রাতের পর রাত উদ্‌ঘাটিত অসতী স্ত্রী আর ব্যভিচারী স্বামীদের নাটক, আমাদের হাল্কামেজাজে দেওয়া লঘু প্রতিশ্রুতির লঙ্ঘন, আইন লঙ্ঘনে আমাদের পারদর্শিতা, এসব দেখে সে আমাদের নীতিবোধ সম্পর্কে তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। যেসব নৈতিক বিধি দেশীয় দর্শকেরা চিত্রগৃহের পর্দায় বৃটিশদের দ্বারা অবহেলায় লঙ্ঘিত হতে দেখে, ভারতে প্রবাসী বৃটিশদের পক্ষে সেইসব বিধির মাহাত্ম্য-প্রচার বা সেগুলি পবিত্রতা-প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করা দুষ্কর।'[১] (১৭ নভেম্বর, ১৯২১)

উচ্চমন্যতা আর হীনমন্যতা তো একই মুদ্রার দুই পিঠ। সেই দ্বৈতের বিক্রিয়াই জন্ম দেয় ভয় আর অনিশ্চয়তার। বৃটিশ ভারতে সেন্সারব্যবস্থার প্রবর্তন সেই মানসিকতারই ইঙ্গিতবাহী।

৫. স্পর্শকাতর প্রশাসন

ভারতে বৃটিশ প্রশাসন এমন একটা সময়ে সেন্সারব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, এদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্যকলাপ যখন ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল ক্রমশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যাপক অসন্তোষ, বিক্ষোভ আর উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে বিভিন্ন গণ-সংগঠন এবং সেসবের কাজকর্মের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী বদল করতে বাধ্য হয়েছিল সেসময়কার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল—কংগ্রেস। গান্ধীর প্রভাবে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনেও সামিল হতে হয়েছিল দলটিকে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচীতে সামিল ছিলো ঔপনিবেশিক সরকারের দেওয়া সম্মানসূচক নিয়োগ ও উপাধি বর্জন, সরকারী সম্বর্ধনা প্রত্যাখান, বৃটিশ-স্থাপিত স্কুল-কলেজ-আদালত বর্জন, আইনসভার নির্বাচন এবং আমদানী পণ্য প্রভৃতির বয়কট। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচীতে ছিলো সরকারকে দেয় কর বয়কটের ঘোষণা। ১৯২০ সালের ১ আগস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল। পাশাপাশি মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্যোগে চলছিল খিলাফৎ আন্দোলন, ভারতীয় মুসলমান সমেত সমগ্র সুন্নি সম্প্রদায়ের অন্যতম খলিফা তুরস্ক-এর সুলতানের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। আন্দোলনের নেতাদের কাছে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন ও সুলতানের পদচ্যুতি আসলে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আগ্রাসী নীতির প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। ফলে আন্দোলনের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের বদলে এটির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্রই বেশি গুরুত্ব

পেয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সমান্তরাল বিকাশের ফলে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়েছিল—অন্তত সমাজ-রাজনীতির ক্ষেত্রে। আবার এই দুই আন্দোলনের প্রভাবে শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণীভিত্তিক ব্যাপক আন্দোলনের পরিসরও ব্যাপ্ত হচ্ছিল ক্রমশ। ১৯২১ সালের শেষদিকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়ালো বিস্ফোরক।

ঔপনিবেশিক সরকারও বিভিন্ন দমনমূলক আইনের সাহায্যে, সংগঠিত, বিধিবদ্ধ উপায়ে এই গণজোয়ারের মোকাবেলায় নামলেন। ১৯২২ সালের গোড়া থেকেই শুরু হলো ব্যাপক ধর-পাকড়। ১ ফেব্রুয়ারী গান্ধী সরকারী নির্যাতন বন্ধের দাবি জানিয়ে চরমপত্র পাঠালেন ভাইসরয় লর্ড রিডিং-এর কাছে। তাতে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের কর-বন্ধ আন্দোলন শুরু করার হুমকি দিলেন।

অথচ কিছুদিনের মধ্যেই গান্ধী নিজেই এই গণজাগরণের স্রোত রুদ্ধ করলেন চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার অজুহাতে আন্দোলন প্রত্যাহার করে। গুজরাটের বারদোলিতে কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীর এই সিদ্ধান্তকে আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানানো হলো। এব্যাপারে অবশ্য কংগ্রেসের অন্তর্ভূ্ত বহু গণসংগঠনই প্রতিবাদ জানিয়েছিল, বামপন্থীরা একটি বিকল্প রাজনৈতিক সংঠনের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে অনুভব করে-ছিলেন, আর সন্ত্রাসবাদীদের গোপন কার্যকলাপেও এসেছিল নতুন জোয়ার। তবু সাংগঠনিক নেতৃত্বের অভাবে এবং ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলি কিছুটা পশ্চাদপসরণ করেছিল। ব্যাপারটা হতোদ্যম সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

বৃটিশ বুর্জোয়ার দল এই সুযোগে প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় তাঁদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষতিগুলি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় তৎপর হয়ে

উঠলেন, বিভিন্ন বৈষম্যমূলক বাণিজ্যনীতির সহায়তায়। এইসব ব্যবস্থার ফলে ভারতের বাজারে বৃটিশ পণ্যের প্রবেশ হলো আরো সহজ, অথচ বৃটেন-এর বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ হলো আরো কঠিন।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও মণ্টাগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের উদারনৈতিক ভিত্তিগুলি ক্রমশ পরিত্যক্ত হচ্ছিল। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে কর্মনীতি-সংক্রান্ত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারটুকু দেওযার ব্যাপারেই বৃটেন-এব অনিচ্ছার কথা স্পষ্টতই ঘোষণা করলেন প্রদেশগুলিতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক কর্মচারীদের পূবেকার করায়ত্ত ক্ষমতাগুলি দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হলো এবং তাঁরাও খোলাখলিভাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ-গুলিতে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে চলতে শুরু করেন। ১৯২০-২১ সালে গণজাগরণেব পবিবেশে যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সূচনা হয়েছিল, তাতেও ফাটল ধবাতে সমর্থ হয়েছিলেন বৃটিশ ঔপনিবেশিকেরা। বিশেষ নিবাচকমণ্ডলীব ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ আর শত্রুতাবৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগাচ্ছিলেন। আরো ছোটখাটো কিছু ব্যবস্থার সূত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের এই প্রত্যাঘাত অব্যাহত ছিলো ১৯২৭-২৮ সাল পর্যন্ত।

রাজনৈতিক এই পটপরিবর্তনের স্তরগুলি প্রতিফলিত হয়েছে সেন্সারবিধি প্রয়োগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তে।[১]

আমবা দেখেছি, সেন্সার-পর্ষদগুলিতে সরকারী পদাধিকারীর সংখ্যা এবং মনোনীত সাধারণ নাগরিকদের সংখ্যা ছিলো সমান। কিন্তু পর্ষদ-সভাপতি হিসেবে পুলিস কমিশনাররাই ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালীও। সুতরাং এটা তো স্বাভাবিকই যে, সদস্যদের মধ্যে ছবি পরীক্ষার দায়িত্ব তিনি বণ্টন করবেন নিজের

পছন্দমতো। লিখিত কোনো নির্দেশ যদিও ছিলো না, তবু আজ আমরা জানি যে, পর্ষদের বেসরকারী ভারতীয় সদস্যদের ভূমিকা ছিলো গৌণ। তাঁরা কেবলমাত্র ছবির নৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন, এরকম একটা রী'ত চালু হয়ে গিয়েছিল। উত্তেজক রাজনৈতিক বিষয়বস্তু থাকতে পারে, এরকম কোনো বিদেশী ছবির ক্ষেত্রে ভারতীয় সদস্যদের সাধারণত ডাকাই হতো না। আর উত্তেজনাকর ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে কখনো একজনকে রাখা হতো নিছক উপদেষ্টার ভূমিকায়, রাজনীতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতগুলির মর্মোদ্ধারে সাহায্য করার জন্যে। তবে নির্বাক ছবির যুগে সে-প্রয়োজন দেখা দিতো কদাচিৎ।

কথাটা শুনতে হয়তো আশ্চর্য লাগবে, তবু এটাই ঘটনা যে, অননুমোদিত ছবির উদাহরণের চেয়ে পরিশোধিত ছবির উদাহরণ থেকেই প্রশাসনের স্পর্শকাতরতার মাত্রা এবং গভীরতা ভালো বোঝা যায়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই সেন্সার-পর্ষদ (অথবা প্রশাসন) ছবি দেখানোর দরখাস্ত সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন কোনোরকম কারণের উল্লেখ ছাড়াই। ছবির মধ্যে কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিন্তু নির্দিষ্ট দৃশ্য বা সাবটাইট্‌ল-টির উল্লেখ ছাড়া কাজ হয় না, এবং সেই উল্লেখ থেকেই আপত্তির কারণটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিয়াল্লিশটি নিষেধবিধির প্রত্যেকটির কার্যকারিতাই প্রমাণিত হয়েছিল এবং সেগুলির সদ্ব্যবহার হয়েছিল, একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। তবে উদাহরণ সহযোগে আমরা আপত্তির মূল কারণগুলি পর্যালোচনা করতে পারি।

জাতিদম্ভ প্রকাশের পথে অন্তরায় হতে পারে, এমন কোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ উল্লেখও বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না প্রশাসন। তাঁদের প্রচারযন্ত্রের সমস্ত শক্তি তখন শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের অতি-মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রচারের দুরূহ ব্রতে নিয়োজিত। ফলে বাদ হয়েছে এইসব দৃশ্য :

১) মুসলিম দস্যুরা শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের ধরে আছে এবং আদর করছে।
২) ইওরোপীয় পুরুষ নাচঘরে কোনো তিব্বতী মহিলাকে আলিঙ্গন করছে।
৩) চীনা পুরুষেরা শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের গলা টিপে ধরেছে।
৪) ইংরেজ যাজক তৃষ্ণায় কাতর।
৫) শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের সম্মিলিত নৃত্য।

সরাসরি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনা হয়নি যেসব ছবিতে, এমন বহু ছবিও পড়েছে সেন্সার-পর্ষদ এবং প্রশাসনের রোষদৃষ্টিতে। 'নৈতিক অবক্ষয়রোধের' এক তথাকথিত সদিচ্ছাই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমহীনভাবে অজুহাত হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমাদের সন্দেহ, শ্বেতাঙ্গদের নৈতিক শৈথিল্যের কোনো দৃশ্যগোচর সাক্ষ্য থাক্, এটা আসলে চান নি প্রশাসন। 'ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট'-এর প্রতিবেদন আমাদের সন্দেহকেই দৃঢ়মূল করে। পরিবর্জনের তালিকাটি এইরকম :

১) কৌচে উপবিষ্ট পুরুষকে নারীর শয্যায় আহ্বান।
২) ভোজদৃশ্যে নেশাগ্রস্ত পুরুষ-রমণীর পারস্পরিক সোহাগ।
৩) শায়িত স্ত্রীর পদাঙ্গুলিতে স্বামীর চুম্বন।
৪) নায়ক কর্তৃক নায়িকার বক্ষ-আলিঙ্গন।

খৃস্টধর্ম এবং পাশ্চাত্য-পুরাণের অবমাননা হয়েছে বলে বাদ পড়েছিল এইসব দৃশ্য :

১) নগ্নপ্রায় অ্যাডাম-এর হেঁটে যাওয়া।
২) মিশর সম্রাট-এর (ফারাও) স্ত্রী কর্তৃক যোসেফ-কে (যীশুর পিতা) ইঙ্গিতপূর্ণ আহ্বান।
৩) আবেল-এর শরীরের ওপর ইভ এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে যাতে স্তনদুটি দেখা যায়।

দেশপ্রেমমূলক বা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সামান্যতম উল্লেখেই উদ্যত

হতো সরকারের খড়্গহস্ত। বরদাস্ত করা হতো না এমনকি সাম্রাজ্যবাদী-নীতির পক্ষে 'ক্ষতিকারক' পরোক্ষ কোনো ইঙ্গিতও। ফলে বাদ পড়েছিল এইসব দৃশ্য এবং সাবটাইট্‌ল্ :

১) কনস্ট্যান্টিনোপল শহরে বৃটিশ সেনাবাহিনীর খোলা বেয়নেট হাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের ঠেকানোর দৃশ্য।

২) সাবটাইট্‌ল্-এ 'বিশৃঙ্খল আয়ার্ল্যাণ্ড' বা 'আয়ার্ল্যাণ্ড-এ পুলিসী দমননীতি' ইত্যাদির উল্লেখ এবং সংশ্লিষ্ট দৃশ্য।

৩) সাবটাইট্‌ল্—'আমরা এখন স্বৈরাচারী শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার যুদ্ধে নিয়োজিত, যে যুদ্ধে একদা অংশ নিয়েছিল তোমাদের দেশও'।

৪) সাবটাইট্‌ল্—'নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসাই ছিলো আমার হতভাগ্য ভাইয়ের একমাত্র অপরাধ'

৫) সাবটাইট্‌ল্—'কুখ্যাত ভারতীয় বিক্ষোভকারী গান্ধী ধৃত'।

৬) সাবটাইট্‌ল্—'আইনকে ধিক্। আমরা জনগণ—আমরাই আইন'।

৭) সাবটাইট্‌ল্—'অহিংস পথে যদি কার্যসিদ্ধি না হয়, তাহলে আমরা শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবো না'।

৮) সাবটাইট্‌ল্—'সাথীরা, আর কতদিন আমরা এই বিদেশীদের হস্তক্ষেপ সহ্য করবো?'

পর্ষদের নির্দেশে পরিবর্তিতও হয়েছে সাবটাইট্‌ল্। যেমন, ১৯২১ সালে আমেরিকার ছবি 'হাচ অব দ্য ইউ. এস. এ'-তেই দুবার :

১) 'সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যেদিন সরকার হবে জনগণের জন্যে জনগণের সরকার'—এই সাবটাইট্‌ল্-এর জায়গায় 'সেই দিনের স্বপ্ন দেখেছি যখন দেশ জুড়ে বিরাজ করবে

সুখ ও শান্তি।'

২) 'কিন্তু এ তো হত্যা। ওরা আমাদের নিজেদের লোক !'
—এই সাবটাইট্‌ল্‌-এর জায়গায় 'আপনার আদেশ পালন করা কি বাধ্যতামূলক ?'

সবচেয়ে স্পর্শকাতর চারটি বিষয় এইভাবেই চিহ্নিত হয়ে গেলো সেন্সারব্যবস্থার শৈশবেই।

ভারতে সেন্সারব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সম্পূর্ণ ছাব নিষিদ্ধ করার প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯২০ সালের ২০ অক্টোবর। বোম্বাইয়ের সেন্সার-পর্ষদ আমেরিকাব 'ভার্জিন অব স্তাম্বুল' নামের ছবিকে অনুমোদন দিতে অস্বীকার করলেন, যদিও তার আগেই ছবিটি রেঙ্গুন-পর্ষদের অনুমোদন পেয়েছিল। বোম্বাই-পর্ষদের বক্তব্য ছিলো এই যে, এ-ছবিতে প্রকাশিত 'কিছু ভাব-অভিব্যক্তি মুসলিম সমাজকে অসন্তুষ্ট করতে পারে'

সেই শুরু। তারপর থেকে ১৯২৭-২৮ সাল পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন সেন্সার-পর্ষদে যে ১১৭-টি ছবি পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে, তার হিসেবটি এইরকম :

কলকাতা	৬১
বোম্বাই	৩৯
রেঙ্গুন	১৭

লক্ষ্য করার বিষয়, এই সময়ের মধ্যে মাদ্রাজ এবং লাহোর-পর্ষদ কোনো ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন নি।

ছবির অংশবিশেষ পরিশোধনের ক্ষেত্রে যে-যে সাধারণ কারণ প্রাধান্য পেতো সম্পূর্ণ ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নেপথ্যেও সেই কারণগুলি ছিলো। তবে, কারণগুলো সবসময় খুব যে স্পষ্ট-ভাষায় ঘোষণা করা হতো, তা নয়। সুতরাং উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি মাত্র ছবির কথাই এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারবো।

বোম্বাইয়ের সেন্সার-পর্ষদ ছাড়পত্র দিয়েছিলেন 'দ্য প্রিন্স অব

ভারত' নামের ভারতীয় ছবিটিকে, ১৯২১ সালে। লণ্ডন-এর ভারত-সচিব ছবিটির ওপর ভারতব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারী করেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কোনো খবরের ভিত্তিতে তাঁর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল যে এ-ছবি ইওরোপীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে বা মানসিকতায় আঘাত করবে।

১৯২১ সালেই রেঙ্গুন-পর্ষদ থেকে ছাড়পত্র পাওয়া বিদেশী ছবি 'এক্সপ্লয়েট্‌স্‌ অব সাবমেরিন ইউ থার্টি ফাইভ' কলকাতা-পর্ষদের ছাড়পত্র পায় নি, কারণ ছবিটি নাকি 'বৃটিশ মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর'। একই বছরে ভারতীয় পটভূমিতে তৈরি আমেরিকার 'ট্রিস্ট্র্যাম সাহিব' ছবিতে একজন পুরোহিতকে দেখানো হয়েছিল, যিনি সেনাদলের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করেছিলেন। এ-ছবিটিও নিষিদ্ধ হয়েছিল।

সবচেয়ে বেশি হৈ-চৈ হয়েছিল অবশ্য 'দ্য লায়ন্‌স্‌ ক্ল' (অথবা 'মুনলাইট') ছবিটি নিয়ে, ১৯২১ সালেই। কলকাতা এবং রেঙ্গুন-পর্ষদ থেকে ছাড়পত্র পাওয়া এই ছবিটিকে বোম্বাই-পর্ষদ ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করলেন। এবং তাঁদেরই অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লীর স্বরাষ্ট্র দপ্তর এ-ছবির ওপর 'রাজনৈতিক' কারণে ভারতব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। এই 'রাজনৈতিক' কারণটি যে আসলে কী, তা বোঝা যাবে বোম্বাই-পর্ষদের মন্তব্য থেকে—'কোনো সুলতান-কর্তৃক জারী করা ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে একজন আফ্রিকান শাসক (বৃটিশ-বিরোধী) বিদ্রোহ-সংগঠনে ব্যস্ত, এ-ছবিতে তা-ই দেখানো হয়েছে।' অর্থাৎ এ-ছবি (ক) পাশ্চাত্য-কবলিত আফ্রিকা-মহাদেশে বিদ্রোহের সম্ভাবনা প্রকাশ করছে, এবং (খ) এ-ও দেখাচ্ছে যে কৃষ্ণকায় মানুষগুলো ঔদ্ধত্যভরে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের 'অবমাননা' করছে। ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ছবির পর্দায় স্বাধিকার-চেতনার কোনোরকম প্রতিফলনই বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না ইংরাজ প্রশাসন।

অবশ্য এই ধরনের 'রাজনৈতিক' কারণে ভারতীয় ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের উদাহরণ পাওয়া যাবে অল্পই। স্বাভাবিক

কারণেই সদ্যোজাত ভারতীয় চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের কর্ণধারেরা বৃটিশ প্রশাসনকে চটিয়ে ছবির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নষ্ট করার দিকে বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন না। তার মধ্যে অবশ্য 'ভক্ত বিদুর' (১৯২১) ছবির ঘটনাটি হয়ে আছে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বোম্বাইয়ের কোহিনুর ফিল্ম্‌স্‌ কোম্পানীর তৈরি এ-ছবিতে গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতীকী রূপায়ণ আছে। ছবির শুরুতেই দেখা যায় ভারতের মানচিত্র থেকে বার হয়ে আসছেন ভারতমাতা। সারা ছবিতে বিদুরকে উল্লেখ করা হয়েছে 'বিদুরজী' হিসেবে। এ-ও দেখানো হয়েছে, তিনি খদ্দরের পোশাক আর গান্ধীটুপি পরে চরকায় সুতো কাটছেন এবং কৃষকদের বোঝাচ্ছেন তারা যাতে সরকারকে কর-খাজনা না দেয়। এইসব দৃশ্যের মধ্যে যে অসহযোগ আন্দোলনেরই ছায়া ছিলো, তা বলাই বাহুল্য। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সভায় বিশ্বস্ত-অনুগত সভাসদদের উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'ডাক্কি বাহাদুর', যা বৃটিশ প্রশাসনের দেওয়া 'দেওয়ান বাহাদুর' উপাধিরই রূপান্তর (ইংরেজিতে যাকে বলে প্যারডি)। এইসব দেখেই মাদুরাই-এর কালেক্টার লিখেছিলেন, 'অশিক্ষিত হিন্দু দর্শকদের কাছে এ-ছবির এক বিশেষ আবেদন আছে। কারণ এই দর্শকেরা তাদের পুরাকাহিনী খুব ভালোভাবেই জানে এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও তার একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। এমন অবস্থায় ছবিটি বিশেষ ক্ষতিকরই হবে।' উচ্চপদস্থ এই সরকারী কমচারীর তৎ-পরতাতেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'ভক্ত বিদুর' ছবিটিকে নিষিদ্ধ করা হলো। কারণ হিসাবে জানানো হলো, 'এ ছবি সরকার-বিরোধিতায় ইন্ধন জোগাবে এবং অসহযোগে জনগণকে প্ররোচিত করবে।'

'ভার্জিন অব স্তাম্বুল' আর 'এক্সপ্লয়েট্‌স্‌ অব সাবমেরিন ইউ থার্টি ফাইভ' ছবি দুটির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি একটি আঞ্চলিক পর্ষদের অনুমোদনপত্র অন্য একটি আঞ্চলিক পর্ষদ বাতিল করেছেন। স্পষ্টতই এই ব্যবস্থা সিনেম্যাটোগ্রাফ আইনের (১৯১৮) ৭ নম্বর

ধারার ৩ নম্বর উপধারা অনুযায়ী। তবে এক্ষেত্রে অনমুমোদনের বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে সেই উপধারায়, তা যথাযথ পালিত হয়েছে কি না সন্দেহ। হয়তো ছবি দুটির প্রদর্শক-পরিবেশকেরা বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি চাপ দেন নি, না সরকারকে, না সেন্সার-পর্ষদকে। তবে কৌতূহলোদ্দীপক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো ১৯২৪ সালে ডি. ডব্লিউ. গ্রিফিথ এর একটি ছবিকে ঘিরে।

গ্রিফিথ-এর 'অরফ্যান্স্ অব দ্য স্টর্ম' (১৯২৩) ছবিতে ফরাসী বিপ্লবের কিছু কিছু দৃশ্য রূপায়িত হয়েছিল—যেমন, বাস্তিল দুর্গের পতন, গিলোটিন-পর্ব, গণতান্ত্রিক সরকারের জন্ম ইত্যাদি। কলকাতা-পর্ষদ ছবিটিকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করলেন, এটি 'দাহ্য' বিষয়ের অবতারণা করেছে, এই অজুহাতে ('এ-ছবির বিষয় হলো বিপ্লবী প্রচার')। এ-ঘটনা ১৯২৪ সালের ৩০ জানুয়ারীর। তার আগেই অবশ্য ছবিটি বোম্বাই-পর্ষদের ছাড়পত্র পেয়েছিল। সেই ছাড়পত্রের ভিত্তিতে পাঞ্জাব প্রদেশে ছবিটির প্রদর্শনী শুরু হলো (মনে রাখতে হবে, এ-ঘটনা যে সময়ের তখন পাঞ্জাব প্রদেশে কোনো সেন্সার-পর্ষদ গঠিত হয় নি)।

কিন্তু পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার কলকাতার সেন্সার-পর্ষদের নিষেধাজ্ঞার ওপরেই বেশি গুরুত্ব দিলেন। নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করে তাঁরা ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে জানালেন যে, একটি অঞ্চলে কোনো ছবি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে সেই ঘোষণার প্রতিলিপি অন্য প্রদেশগুলিতেও পাঠানো উচিত, যাতে অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারেন। পাঞ্জাব প্রশাসনের এই প্রস্তাব খুবই তৎপরতার সঙ্গে গৃহীত হলো। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ শহর দুটি বাদে ভারতের অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলে ছবিটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। এবং এরপর নিয়ম দাঁড়ালো এইরকম, একটি রাজ্যে কোনো ছবি নিষিদ্ধ হলে সেই নিষেধাজ্ঞার জোরেই বলবৎ হতো। সেন্সার-আইনের

নেতিবাচক প্রয়োগের একটি ব্যাপক ভিত্তি এভাবেই তৈরি হলো প্রশাসনিক তৎপরতায়। কিন্তু ইতিবাচক প্রয়োগের প্রশ্নে কোনো-রকম উদারতার পরিচয় দিতে পারেন নি প্রশাসন—একটি পর্ষদের ছাড়পত্র বিনা প্রশ্নে সারা দেশে গ্রাহ্য হবে, এরকম কোনো আইনগত প্রতিশ্রুতি তাঁরা রাখতে পারেন নি। বিষয়টিকে আইনের অপব্যাখ্যা বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না বোধহয়।

রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হয়ে আছে অবশ্য সের্গেই আইজেনস্টাইন-এর বিখ্যাত ছবি 'ব্যাট্‌ল্‌শিপ পোটেমকিন' (১৯২৫)। ১৯২৫ সালেই সোভিয়েত মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়া' ঘোষণা করেছিল, ভারত এবং আফগানিস্তানের কৃষকদের রুশবিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে যথাযথ অবহিত করার কাজে সোভিয়েত চলচ্চিত্রশিল্পকে ব্যবহার করা হবে। এই ঘোষণাটি জানতে পেরে ভারতীয় প্রশাসনও সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার এবং সেন্সর-পর্ষদগুলির কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, এই ঘোষণার বিবরণের সঙ্গে খাপ খায়, এমন নির্দিষ্ট প্রচারমূলক ছবি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে (১৯১৫ সালের ১১ মে তারিখের চিঠি)। বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার স্থানীয় পর্ষদের সভাপতি হিসেবে 'ব্যাট্‌ল্‌শিপ পোটেমকিন' দেখলেন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রথমে পরিদর্শককে না পাঠিয়ে তিনি নিজেই কাজটি করেছিলেন, এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ। নির্দ্বিধায় তিনি মন্তব্যও করলেন, 'স্পষ্টতই এ-ছবি প্রচারমূলক। কেননা বিশেষ করে বলশেভিক বিপ্লব এবং সাধারণ-ভাবে যে-কোনোরকম কর্তৃপক্ষের উচ্ছেদকে ন্যায়সঙ্গত হিসেবে প্রচার করছে এ-ছবি।' এহেন মন্তব্যের পর ছবিটি নিষিদ্ধ না-হওয়ার আর কোনো কারণ ছিলো না। ১৯২৫ সালে নিষিদ্ধ হওয়া এ ছবির বিষয়ে সরকারী ঘোষণায় অবশ্য একটু ঘুরিয়ে লেখা হলো, 'এ-ছবিতে স্থান পেয়েছে বীভৎসতা, বিদ্রোহ এবং সরকারী স্বৈরাচারের দৃশ্যাবলী এবং এসবের ফলে উত্যক্ত জনগণের বিপ্লব।'

সমতুল কারণে ভারতব্যাপী নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ছবি :

১) 'সাইবেরিয়া' (১৯২৬)—'প্রতিষ্ঠিত সরকারের উৎখাত হলো এ-ছবির বিষয়।'

২) 'গিল্‌টি কনশ্যেন্স' (১৯২৬)—'এ-ছবি অশিক্ষিত সিনেমা-দর্শকের চোখে সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে।'

৩) 'রোজ অব ব্লাড' (১৯২৮)—'এ-ছবি শ্রেণীযুদ্ধের সপক্ষে প্রচার চালায় এবং ঘাতক-হত্যাকারীদের গুণকীর্তন করে।'

গ্রিফিথ-এরই অন্য একটি বিখ্যাত ছবি 'বার্থ অব আ নেশন' (১৯১৫) এবং ফ্রিৎস লাঙ্-এর ছবি 'মেট্রোপলিস' (১৯২৮) ভারতব্যাপী নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছিল 'রাজনৈতিক' কারণেই। অবশ্য ছবি দুটিকে পরে, যথাক্রমে ১৯টি এবং ১৮টি পরিবর্জনের পর, ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল।

খোদ ইংল্যাণ্ড-এর ছবি 'দ্য চাইনীজ বাংলো' নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলো ১৯২৬ সালে। কারণটা লক্ষ্য করার মতো :

'এর উপজীব্য হলো একটি অবাঞ্ছিত বিষয়। দুজন ইংরেজ পুরুষ এবং দুজন ইংরেজ মহিলাকে এছবিতে এমনসব আচরণে লিপ্ত হতে দেখা গেছে, যেগুলি নৈতিক বিচারে তো বটেই, এমনকি অন্যান্য সাধারণ মানদণ্ডেও, খুব সুখপ্রদ নয়। অথচ জনৈক চৈনিক পুরুষের আচার-ব্যবহার তুলনায় অনেক মার্জিত রুচিসম্পন্ন। ছবির আর একটি বিতর্কিত অংশ হলো প্রাচ্যদেশীয় পুরুষের সঙ্গে পাশ্চাত্য মহিলার বিবাহের প্রশ্নটি।'

'রাজার জাত'-কে যে-ছবিতে 'শাসিত, পদাবনত' জাতির তুলনায় ·হীন দেখানো হয়, সে-ছবি সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছে অবাঞ্ছিত

বই কি! তাছাড়া এ-ছবি এশীয় এবং ইওরোপীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাব্যতা বিষয়েও আলোকপাত করতে চায় যে! এরকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়, আমরা জানি, সমানে সমানে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের পাঠ্যপুস্তক তো বলে, পাশ্চাত্যের মানুষ প্রাচ্যবাসীদের চেয়ে সবদিক থেকেই অনেক বেশি উন্নত, সুতরাং অনেক বেশি মর্যাদারও অধিকারী। ইওরোপীয়-এশীয় সমানাধিকারের প্রশ্নটি সাম্রাজ্যবাদী যুক্তিতে অবাস্তব—পারস্পরিক বিবাহ-সম্পর্কও সেই একই যুক্তিতে অন্যায্য, অসিদ্ধ। উপনিবেশের মানুষদের সামনে এইসব বিষয়ের অবতারণাই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের না-পসন্দ্।

একই কারণে, এমনকি ছবি এদেশে এসে পৌঁছনোর আগেই, কোনো বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে প্রশাসনের হাতে ছবির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, এমন উদাহরণও পাওয়া যাবে। যেমন, 'আফটার দ্য স্টর্ম' নামের আমেরিকান ছবিটি। এটি যখন সিঙ্গাপুর-এ দেখানো হচ্ছিল, তখনই সেখানকার বৃটিশ রেসিডেন্ট ছবিটির বিষয়ে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন লণ্ডন-এ। তিনি লিখেছিলেন, 'একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে দেখা যায় প্রাচ্যদেশীয় কোনো পানশালায় স্থানীয় অধিবাসী দ্বারা পরিবৃত অবস্থায় পানরত, নেশাগ্রস্ত'। এটা ১৯২৭ সালের কথা। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে ছবিটি যখন এদেশে এলো, সরকারী এক ঘোষণায় সেটিকে নিষিদ্ধ করা হলো। এমনই ছিলো ঔপনিবেশিক সরকারের স্পর্শকাতরতা।

ডি. ডব্লিউ. গ্রিফিথ-এর ছবি 'ব্রোক্ন ব্লসম্স্' (১৯২৪) কলকাতার সেন্সার-পর্ষদের ছাড়পত্র পাওয়া সত্ত্বেও মাদ্রাজ, বোম্বাই, বার্মা, পাঞ্জাব, দিল্লী প্রদেশসহ ভারতের অন্য সমস্ত অঞ্চলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। কারণ, এ-ছবি 'অত্যাচার এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার রূপায়ণ করে এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে অসৌজন্যসূচক তুলনার অবতারণা করে'। আবার, বোম্বাই-পর্ষদ থেকে ছাড়পত্র

পাওয়া ছবি 'ট্রায়াম্ফ অব দ্য র‍্যাট'-এর (১৯২৭) ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী হলো কলকাতা পুলিস-এর সুপারিশে : এ-ছবি 'ভারতে সাধারণ প্রদর্শনীর পক্ষে অনুপযুক্ত, কেননা এতে আছে ইওরোপীয় নারীপুরুষের নৈতিক অবনতির চিত্রায়ণ'।

ইওরোপীয়রা 'অতি-মানব', এই ধারণাটি চালু করতে হলে ইওরোপীয়দের খারাপ কাজগুলোকে উপনিবেশবাসীদের চোখের আড়ালে রাখতে হবে বইকি! এমনকি, পরোক্ষে প্রসঙ্গটির উল্লেখ বিষয়েও যে কতখানি সজাগ এবং সতর্ক ছিলেন সরকার, তার সামান্য কিছু প্রমাণ আমরা আগেই পেশ করেছি—দেখিয়েছি যে, 'নৈতিক অবক্ষয়রোধ'-এর ঘোষিত সদিচ্ছা আসলে নেহাৎই অজুহাত। এপ্রসঙ্গে আরো কিছু উদাহরণ দাখিল করা যেতে পারে। জার্মানীর ছবি 'ভ্যারাইটি' (১৯২৮) নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলো, কারণ 'এটি আপাদমস্তক নিম্নরুচির ছবি এবং অসহ্য সব যৌনদৃশ্যে ভরপুর'। আমেরিকার ছবি 'স্যাডি টমসন'-ও (১৯২৯) নিষিদ্ধ হলো, কেননা এটি 'সুস্থ উপভোগের অযোগ্য এবং স্থূলরুচির ছবি'।

পাশ্চাত্যের 'গরিমা এবং মর্যাদা রক্ষা' করার যে মহান সাম্রাজ্যবাদী দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বৃটিশ প্রশাসন, তার পরাকাষ্ঠা অবশ্য দেখা গেলো ১৯২৫-২৬ সালে। ১৯২৫ সালে সম্পাদিত হলো 'লোকার্নো চুক্তি'। এর দৌলতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান তিন বিবাদী অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে আপাত-সখ্যের একটা সম্পর্কে গড়ে উঠলো, রাজনীতির পরিভাষায় যার নাম দেওয়া হয়েছিলো 'দ্য স্পিরিট অব লোকার্নো'। ১৯২৬ সালে কলকাতায় নিযুক্ত জার্মান কূটনৈতিক প্রতিনিধি সেই সম্পর্কের দোহাই দিয়ে দুটি আমেরিকান ছবির বিষয়ে তাঁদের আপত্তির কথা জানালেন বৃটিশ সরকারকে। ছবি দুটি—'দ্য বিগ প্যারাড' (১৯২৫) এবং 'মেয়ার ন্যস্ট্রাম' (১৯২৫)—প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানদের 'বীরত্ব' তথা অত্যাচারের চিত্রায়ণ করেছিল। কিন্তু জার্মান কন্সাল-এর

আপত্তিতে কাজ হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। সেন্সার-পর্ষদের দেওয়া ছাড়পত্র বাতিল করলেন প্রশাসন ইণ্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট-এর ৭ নম্বর ধারার ৭ উপধারা অনুযায়ী (১৯২৬ সালের ২০ মার্চ বিজ্ঞাপিত ৯১৮ নম্বর আদেশ)। একই ভাবে ১৯২৭ সালের ৮ এপ্রিল ১১৮৫ নম্বর প্রশাসনিক আদেশবলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো 'স্পোর্টিং লাভার' এবং 'কিকিং দ্য জার্ম আউট অব জার্মানী' নামের দুটি আমেরিকান ছবি। প্রথম ছবিতে ছিলো অসামরিক হাসপাতালের ওপর জার্মানদের বোমাবর্ষণের চিত্রায়ণ আর দ্বিতীয় ছবিতে ফিল্ড মার্শাল ফন হিণ্ডেনবুর্গ-কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছিল।

১৯২৭ সালে পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার কিছু প্রগতিশীল চলচ্চিত্র-প্রেমী 'সী হর্সেস' নামে একটি ছবি করেছিলেন। তাতে পর্তুগীজ শাসক এবং রাজকর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতার একটা বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ ছিলো। পর্তুগালে বা সেদেশের অন্যান্য উপনিবেশে ছবিটি দেখানোর কোনো প্রশ্নই ছিলো না। ১৯২৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অবশ্য ছবিটা কলকাতা-পর্ষদের ছাড়পত্র পেলো। বলাই বাহুল্য যে, ছবিটির বিষয়ে ভারতে নিযুক্ত পর্তুগীজ রাষ্ট্রদূত প্রতিবাদ জানাবেন।

প্রতিবাদপত্রটি এলো বাংলার প্রাদেশিক সরকারের কাছে। ততদিনে ছবিটি বাংলাদেশ থেকে উঠে গেছে। ফলে কলকাতা-পর্ষদ এই মর্মে নির্দেশ জারী করলেন যে, 'ছবিটি বাংলায় পুনঃ-প্রদর্শনের জন্যে আনীত হলে সেটিকে আর একবার কলকাতা-পর্ষদে পরীক্ষার জন্যে দাখিল করতে হবে'। বোম্বাইয়ের পর্ষদ প্রথমে ছবিটিকে ছাড়পত্র দিতেই অস্বীকার করলেন। কিছু কাটছাঁটের পর অবশ্য ছাড়পত্র মঞ্জুর হলো। মাদ্রাজেও ছাড়পত্র পেতে ছবিটির কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছবি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

অবস্থা একসময় এমন জায়গায় চলে যায় যে, ভারতে নিযুক্ত

বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশের রাষ্ট্রদূতেরা তাঁদের নিজেদের দেশের পক্ষে 'অবাঞ্ছিত' বলে বিবেচিত ছবি সম্পর্কে সরাসরি সেন্সার-পর্ষদেই তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়ে দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা গ্রাহ্যও হতো!

মহাযুদ্ধোত্তর গণজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালো 'ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভাজন নীতি'। গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি আলী-ভাইদের অনুপ্রাণিত খিলাফৎ আন্দোলনের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসন একথা বুঝে গিয়েছিলেন যে, ভারতীয় স্বাধিকার চেতনার অন্যতম শরিক হিসেবে উপমহাদেশের মুসলিমরাও দ্রুত পরিণত হচ্ছেন। এ-ও বোঝা গিয়েছিল যে, সেই পরিণতির স্রোত রুদ্ধ করতে প্রত্যক্ষ দমনপীড়ন যথেষ্ট হবে না। ফলে কূটকৌশল স্থির হলো, পক্ষপাতদুষ্ট প্রশ্রয়-দানের মাধ্যমে সবরকম রাজনৈতিক বিক্ষোভ থেকে মুসলিমদের যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। প্রশাসনের হিসেবে, এভাবে কালক্রমে উপমহাদেশের প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে একটা ব্যবধান তৈরি করা যাবে, যার ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি হবে দৃঢ়। এই হিসেবমতো চলতে গিয়ে মুসলিমদের ছোটখাটো বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দাবির প্রতি প্রশাসন অত্যধিক মনোযোগী হয়ে পড়লেন—খানিকটা দৃষ্টিকটু-ভাবেই। ১৯২৪ সালে, প্রশাসনেরই পরোক্ষ উস্কানিতে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের যেসব ঘটনা ঘটেছিল, সেসবের অজুহাত দেখিয়ে প্রশাসনের নেওয়া বহু সিদ্ধান্তেই পক্ষ-পাতিত্বের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। এমনকি এর জের পড়লো চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণেরও ক্ষেত্রে।

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে 'রাজিয়া বেগম' নামের একটি ভারতীয় ছবিকে বোম্বাই-পর্ষদ ছাড়পত্র দেওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাব, দিল্লী, সংযুক্ত

প্রদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে ছবিটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো ধর্মীয় কারণে ('অনৈতিক, কুরুচিকর এবং মুসলিম-দৃষ্টিভঙ্গীতে আপত্তিকর')। বোম্বাই-পর্ষদের ছাড়পত্র পাওয়া ছবি 'পুনা রেইডেড' (১৯২৫) বার্মা, বিহার এবং উড়িষ্যায় নিষিদ্ধ হলো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আশঙ্কায় ('স্থানীয় হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিরাগ এবং বিতর্কের জন্ম দিতে পারে')। ১৯২৫ সালেই 'ফর্টিয়েথ ডোর' নামের আর একটি ছবিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হলো। এই ছবিতে মধ্যপ্রাচ্যে খৃস্টানদের ওপর মুসলিম উগ্রপন্থীদের অত্যাচার এবং পরিণামে এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রক্তাক্ত বিবাদ-সংঘর্ষের রূপায়ণ হয়েছিল। মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানতে পারে, এই আশঙ্কায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল সিসিল বি. ডি'মিল-এর বিখ্যাত 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্ট্স্' ছবিটিকে, ১৯২৬ সালে।

'শিরাজ' নামের একটি ভারতীয় ছবিতে ছিলো জনৈক মৃৎকারের গল্প। এই মৃৎকার নাকি ছিলেন বাদশা শাহ্‌জাহান-পত্নী বেগম মুমতাজ-এর অন্যতম প্রণয়ী। ইনিই নাকি মুমতাজ-এর মৃত্যুর পর একটি স্মৃতিসৌধের নকশা তৈরি করে বাদশা শাহ্‌জাহানকে দিয়ে সেটি অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন; পরে নির্মিত স্মৃতিসৌধটি 'তাজমহল' নামে বিখ্যাত হয়। খানদানী মুসলিম সম্প্রদায় ছবিটির বিষয়ে আপত্তি জানালেন। কারণ, এ-ছবি (১) মুমতাজ-শাহ্‌জাহান প্রেম-সম্পর্কের গভীরতার বিষয়ে সন্দেহের জন্ম দিয়েছিল, এবং (২) অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ নাগরিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত রেখেছিল। সুতরাং প্রাক্তন শাসককুলের তৈরি একটি অতিকথাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন বর্তমান শাসকগোষ্ঠি। বৃটিশ ইনস্ট্রাকশ্যনাল ফিল্ম কোম্পানীর তৈরি ১৯২৮ সালের এই ছবি নিষিদ্ধ হলো।

বাদশা আকবর-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম (পরে যিনি হয়েছিলেন

বাদশা জাহাঙ্গীর) এবং সাধারণ বংশের কন্যা আনারকলি-র প্রেম-কাহিনী নিয়ে তৈরি ছবি 'আনারকলি'-ও নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯২১ সালে, প্রথমে দক্ষিণ ভারতের ম্যাঙ্গালোর শহরে, এবং পরে সারা বৃটিশ ভারতে।

কট্টর ইসলামপন্থীদের বিশ্বাসভাজন হতে এবং তাদের সমর্থন আদায় করতে প্রশাসন যে তখন খুবই তৎপর, ছোটখাটো এইসব ঘটনাই তার প্রমাণ।

ওপরের উদাহরণগুলি থেকে ভারতে চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে নিয়ামক কয়েকটি সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত নীতির বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যায়। তবে এইসব সাধারণ নীতির বাইরেও তাৎক্ষণিক অবস্থা-প্রসূত কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে প্রশাসনকে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনোভাবেই যাতে বিব্রত হতে না হয়, এটাই ছিলো প্রশাসনের লক্ষ্য।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় 'লাইফ অব দ্য বুদ্ধ' ছবির কথা। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কূটনৈতিক হিসেবের মধ্যে বৌদ্ধদের অবস্থান নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিলো না। তবু বৌদ্ধদের আপত্তির ফলে ম্যাডান কোম্পানীর তৈরি ১৯২৩ সালের এই ছবিকে নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রশাসন। ছবিতে বুদ্ধকে একজন মানুষ হিসেবেই দেখানো হয়েছে—অবশ্যই প্রমাণ করা হয়েছে যে তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা। কিন্তু বুদ্ধের এই মানবমূর্তির চিত্রায়ণেই ছিলো তাঁর রক্ষণশীল অনুগামীদের আপত্তি। এই আপত্তি বিশেষত জোরদার ছিলো বার্মা প্রদেশে। সেখানে তো বটেই, এবং সেই সঙ্গে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ-বেরার, বিহার-উড়িষ্যা এবং দিল্লীতে ছবিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হলো। বাংলার সেন্সার-পর্ষদ প্রথমে ছবিটিকে ছাড়পত্র দিয়েও পরে তা প্রত্যাহার করে নেন। বোম্বাইয়ের পর্ষদ কিছু রদবদলের শর্তে ছবিটি ছাড়পত্র দেন।

ধর্মীয় সংস্কারের দাবিতে সংগঠিত আকালি আন্দোলনের নেতারা

তাঁদের বিভিন্ন কর্মসূচীর সূত্রে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকারকে বেশ অসুবিধেয় ফেলেছিলেন। আন্দোলনের পেছনে ছিলো জাতীয়তা-বাদী রাজনৈতিক দলগুলির নৈতিক সমর্থন। তাছাড়া গান্ধী-অনুপ্রাণিত অসহযোগ আন্দোলনের ধাঁচে এই আকালি আন্দোলনও পরিচালিত হতো। আন্দোলনের মূল কর্মসূচী ছিলো গুরুদ্বার অভিযান, কারণ গুরুদ্বার পরিচালনার রীতিনীতি বিষয়েই ছিলো আকালিদলেব প্রধান আপত্তি। এইসব অভিযানের পোষাকী নাম ছিলো 'জাথা'। এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ 'জাথা'-র ওপর তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন আকালি নেতারা, দেশব্যাপী প্রচারের উদ্দেশ্যে। ছবির নাম 'শহীদী জাথা' (১৯২৪)। ছবির কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাব সরকার এই ছবি নিষিদ্ধ করলেন। এটি দেখারও প্রয়োজন বোধ করেন নি তাঁরা। তাছাড়া এই পাঞ্জাব সরকারেরই উদ্যোগে অন্যান্য প্রদেশেও ছবিটি নিষিদ্ধ হলো।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, সরকারী-নিয়ন্ত্রণাধীন সেন্সার-পর্ষদের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে প্রশাসনিক রক্ষাকবচগুলির (৭ নম্বর ধারার বিভিন্ন উপধারা) প্রয়োগে সরকার বেশ তৎপরই ছিলেন। ১৯২৪-২৫ সাল থেকেই ব্যাপারটা ঘন ঘন ঘটতে থাকে।

বোম্বাইতে ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত অবশ্য ৭ নম্বর ধারার ৩ নম্বর উপধারাটি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি একবারও। এর অর্থ, কোনো ছবি সম্পর্কে পর্ষদের রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেননি প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শকের দল। কলকাতায় এর প্রয়োগ হয়েছিল দুবার। প্রথমবার ১৯২৫-২৬ সালে। সালিশ-এর ভূমিকায় বাংলার প্রাদেশিক সরকার সেবার পর্ষদকে তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান। ছবির অংশবিশেষ পরিবর্জনের শর্তে পর্ষদ শেষপর্যন্ত ছবিটিকে ছাড়পত্র দিতে রাজী হন। ১৯২৭-২৮ সালে অনুরূপ এক ঘটনায় অবশ্য প্রশাসন সেন্সার-পর্ষদের

সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। মাদ্রাজে ৭ (৩) ধারার প্রয়োগ হয়েছিল একবারই, ১৯২৭-২৮ সালে। পরীক্ষক সাব-কমিটির আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সরকার পর্ষদের সমস্ত সদস্যের সামনে বিতর্কিত ছবিটি দাখিল করার নির্দেশ দিলেন। সেখানে অবশ্য ছবিটি ছাড়পত্র পেয়েছিল। বার্মায় ১৯২৪-২৫ সালে একবার এইরকম পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক সরকারের রায়ে সেন্সার-পর্ষদের আপত্তিই বহাল থাকলো।

প্রশাসনের হাতে যে দ্বিতীয় রক্ষাকবচ, অর্থাৎ ৭ (৪) ধারা, তার প্রয়োগের ঘটনা সংখ্যায় আরো বেশি। বোম্বাই-পর্ষদে ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এরকম ঘটনা ঘটেছিল দশটি। দুটি ছবির ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার সেন্সার-পর্ষদের আপত্তি বহাল রেখেছিলেন। ছটি ছবির ক্ষেত্রে সরকারী রায়ে ছবিগুলির অংশবিশেষ বর্জিত হয়েছিল। মাত্র দুটি ক্ষেত্রে সরকার সেন্সার-পর্ষদের সঙ্গে একমত হন নি। কলকাতা-পর্ষদ এই ধারার প্রয়োগ করে ১৯২৫-২৬ সালে একবার একটি ছবির প্রদর্শনী সাময়িক বন্ধ করেছিলেন। পরে প্রাদেশিক সরকারও সেই নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখেন। রেঙ্গুন-পর্ষদে ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মোট নটি ছবি প্রথমে সেন্সার-পর্ষদের আপত্তিতে এবং পরে প্রাদেশিক সরকারের রায়ে অননুমোদিত হয়েছিল। মাদ্রাজ-পর্ষদে অবশ্য এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে নি, অন্তত ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচটি অবশ্য ছিলো ৭ (৬) ধারা, একথা আমরা আগেই বলেছি। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার মোট ১৮৩ বার তাঁদের এই 'সাংবিধানিক' অধিকারটি প্রয়োগ করেছিলেন। প্রদেশভিত্তিক হিসেব এইরকম :

বিহার-উড়িষ্যা—৩৭ ; পাঞ্জাব—৩৬ ; দিল্লী—৩৫ ; সংযুক্ত প্রদেশ—২৯ ; মধ্যপ্রদেশ-বেরার—১৯ ; বার্মা—১০ ;

বোম্বাই—৮ ; আসাম—৭ ; বাংলা—৩।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, সেন্সারব্যবস্থার সূচনা যদিও ১৯২০-২১ সালে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় সত্যিকার 'প্রাণসঞ্চার' হয়েছিল ১৯২৪-২৫ সাল থেকে। এর একটা নেপথ্য ইতিহাস আছে।

৬. সম্ভাবনার নানা স্তর

১৯২১ সালের জুলাই মাসে ভারতসচিব মিঃ এডউইন মণ্টাগু গভর্নর-জেনারেল লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড-এর কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় জানতে চাইলেন, ভারতে চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রতিষ্ঠিত সেন্সার-ব্যবস্থা সন্তোষজনক কিনা। লণ্ডন কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ দেখে দিল্লী-প্রশাসনও কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। সেন্সারব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম বছরটি অতিক্রান্ত হতেই তাঁরা বৃটিশ 'চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ' মিঃ উইলিয়াম ইভান্সকে এদেশের চলচ্চিত্রশিল্প বিষয়ে একটি সমীক্ষা করার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। কমেডিয়ান হিসেবে যিনি একসময় কিছু নাম করেছিলেন, সেই মিঃ ইভান্স এদেশে এলেন ১৯২১ সালের শীতকালে (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে)। এখানে প্রায় ছমাস থেকে এবং সরেজমিনে তদন্ত করে তিনি তাঁর প্রতিবেদন পেশ করলেন সরকারের কাছে। এর মধ্যে সদ্যোজাত সেন্সারব্যবস্থা সম্পর্কেও মতামত দিয়েছিলেন তিনি। প্রথমেই সেন্সার-পর্ষদগুলিকে 'দুর্বল এবং অনভিজ্ঞ' হিসেবে চিহ্নিত করে মিঃ ইভান্স তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন এই ভাষায়: রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যম হিসেবে সিনেমা নামক এই শক্তিশালী অস্ত্রটির ব্যবহার ভবিষ্যতে সাংঘাতিক বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাঁর সুপারিশ ছিলো, কেন্দ্রীয় সরকার যেন প্রাদেশিক প্রশাসনগুলির মাধ্যমে 'বর্তমানের নাম-কা-ওয়াস্তে সেন্সারব্যবস্থাকে আরো শক্ত এবং আরো কার্যকর করে তোলেন'। ভারত সরকারের 'প্রচার উপদেষ্টা পর্ষদ' এই 'ইভান্স রিপোর্ট'-এর সুপারিশগুলি অনুমোদন করলেন। মিঃ ইভান্স-এর সতর্কবাণীর সঙ্গে একথাও তাঁরা যোগ করলেন যে, নিয়ন্ত্রণ আরো

সংহত, সংগঠিত আর শক্তিশালী না করলে অচিরে ভারতীয় প্রযোজক-পরিচালকেরাও এমন সব ছবি তৈরি করবেন, যেগুলো সরকারের চোখে 'পুরোপুরি অবাঞ্ছিত' বলে বিবেচিত হবে। এরকম কোনো সম্ভাবনাকে সমূলে বিনষ্ট করতে তাঁরা প্রস্তাব দিলেন যেন প্রদর্শনীর প্রাক্-অনুমোদন ব্যবস্থার পাশাপাশি নির্মাণের ক্ষেত্রেও কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণবিধি কার্যকর করা হয়।

সেন্সারপ্রথাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার প্রস্তাবটি খুবই তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ করা হলো এবং কাজও শুরু হলো সেই মতো। ১৯২২ সালের ১ জুন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার লণ্ডন-এর ভারতসচিবকে পাঠানো এক বার্তায় এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, 'অশ্লীল ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করাই ভারতে সেন্সারব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য নয়। রাজনৈতিক বিচারে আপত্তিকর প্রদর্শনী বন্ধ করাও এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'। কেন্দ্রীয় সরকার এরপর চারটি ব্যবস্থা নিলেন, যাতে সেন্সারব্যবস্থা আরো 'উন্নত' হয়। ১৯২২-২৩ সালে জারী করা একাধিক সার্কুলারে এইসব ব্যবস্থার কথা বলা হলো।

প্রথমত, স্থানীয় প্রশাসনকে কঠোরতম সেন্সারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করা হলো। রাজনৈতিক বিচারে অবাঞ্ছিত ছবিগুলির বিরুদ্ধে যাতে সত্বর এবং সুনির্দিষ্ট নিয়মমাফিক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এই বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হলো। দ্বিতীয়ত, জেলাশাসক এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ফৌজদারী কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন ছবি এবং দর্শকমহলে সেগুলির প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে খবরাখবর সংগ্রহের ব্যাপারে আরো তৎপর হতে নির্দেশ দেওয়া হলো। অবাঞ্ছিত ছবির বিরুদ্ধে প্রাদেশিক প্রশাসনের কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে যেন কোনোমতেই দেরি না হয়, এ ব্যাপারে তাঁদের সতর্ক থাকতে বলা হলো। তৃতীয়ত, বলা হলো, একটি ছবি কোনো প্রদেশে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে সেই সরকারী ঘোষণার প্রতিলিপি সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের কাছে

পাঠিয়ে দিতে হবে। চতুর্থত, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বলা হলো, তাঁরা যেন তাঁদের অধীনস্থ এলাকায় চলচ্চিত্র-প্রদর্শক এবং পরিবেশক-আমদানীকারীদের জানিয়ে দেন ঠিক কোন্ কোন্ ধরনের ছবি আপত্তিকর বলে বিবেচিত হতে পারে। এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কাছে এই অনুরোধও করতে হবে যে, তাঁরা যেন এই ধরনের ছবি আমদানী বা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকেন।

'প্রচার উপদেষ্টা পর্ষদ'-এর দ্বিতীয় সুপারিশটি নিয়ে অবশ্য বেশ চিন্তায় পড়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী কর্তারা। ১৯২৩ সালের ১১ অক্টোবর ভারতসচিব দিল্লী-প্রশাসনের কাছে জানতে চাইলেন চলচ্চিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে এদেশে কোনো নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু আছে কিনা :

> 'দেশের মধ্যে অথবা দেশের বাইরে প্রদর্শনীর জন্যে যেসব ছবি তৈরি হয়, নির্মাণকালীন অবস্থায়ই সেগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্যে, অথবা অন্তত বাইরের বাজারের জন্যে তৈরি হওয়া ছবিগুলিকে রপ্তানীর আগেই পরীক্ষা করা এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা।'

কিন্তু এরকম কোনো ব্যবস্থার কথা জানিয়ে ভারতসচিবকে আশ্বস্ত করতে পারেন নি দিল্লী প্রশাসন। তখন তাঁরা এইটুকু মাত্র জানিয়েছিলেন যে, বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। প্রায় তিন বছর এই অবস্থায় ('বিবেচনাধীন') থাকার পর সুপারিশটি পরিত্যক্ত হলো, ১৯২৬ সালে, বাস্তব অসুবিধের কথা ভেবেই ('১৯২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে আমাদের যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার ভিত্তিতে এখনই কোনো নতুন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে না।')।

১৯২৩ সালের ১১ অক্টোবর-এর ওই বার্তাতেই ভারতসচিব মিঃ মণ্টাগু এই বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে, বিভিন্ন আঞ্চলিক সেন্সার-পর্ষদের বিচারপদ্ধতি এবং সেসবের ফলাফলে এত বেশি

তারতম্য হচ্ছে যে তাতে সেন্সারব্যবস্থারই দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ভারতীয় প্রশাসনের কাছে তাঁর প্রস্তাব ছিলো যেন তাঁরা বিচারপদ্ধতিতে সমতা আনার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন।

এর আগেই অবশ্য একটি কেন্দ্রীয় সেন্সার-পর্ষদ গঠনের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে সরকারী মহলে। বোম্বাইয়ের আঞ্চলিক পর্ষদ থেকে এই প্রস্তাবটি এসেছিল ১৯২২ সালে। বোম্বাই-পর্ষদের মতে, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং রেঙ্গুন-এর পর্ষদগুলি তাঁদের বিচারপদ্ধতিতে কোনো সুনির্দিষ্ট রীতনীতি অনুসরণ করেন না। বোম্বাই-পর্ষদ চাইলেন নির্দিষ্ট 'সাধারণ নিয়মাবলী'-র ভিত্তিতে একটি মাত্র কেন্দ্রীয়-পর্ষদে সমস্ত ছবির বিচার হোক্ এবং, তাঁদের মতে, বোম্বাই-পর্ষদ সেরকম একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে কাজ করার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের মতামত চেয়ে পাঠালেন।

বার্মা সরকারের মুখ্যসচিব তাঁর চিঠিতে (১৩ এপ্রিল ১৯২২) লিখলেন যে, বার্মা প্রদেশের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ('যেখানে অবতরণের জন্যে রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ বন্দর এবং যেখানকার আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সবকিছুকেই ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত') কেন্দ্রীয় পর্ষদের প্রস্তাবটি তাঁদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। রেঙ্গুন শহরের পুলিস কমিশনার মেজর ম্যাকডোনাল্ডও দৃঢ়তার সঙ্গে এই মত সমর্থন করলেন :

> 'বোম্বাই-পর্ষদের কার্যকারিতা এবং দক্ষতা সম্পর্কে রেঙ্গুন-পর্ষদকে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে হবে—অন্তত সেন্সারব্যবস্থার ক্ষেত্রে। বোম্বাই থেকে ছাড়পত্র নিয়ে আসা বহু ছবিই রেঙ্গুন-এ হয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে অথবা অংশবিশেষ পরিবর্জন / পরিমার্জনের শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন পেয়েছে—কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব করতে হয়েছে স্থানীয় অবস্থার বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য ক্ষেত্রে রেঙ্গুন বোর্ড মনে

করেছেন যে ছবিগুলি সভ্যসমাজে প্রদর্শনেরই উপযুক্ত নয়।'

মাদ্রাজ সরকারের উত্তরে (২৪ এপ্রিল ১৯২২) জানানো হলো :

'একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের সূত্রে কেবল যে ছবি আনা-নেওয়ার জন্যেই অহেতুক অনেকখানি সময় খরচ হবে তা নয়, এরকম একটি সংগঠনে বিভিন্ন প্রদেশের জনমতও ঠিকমতো গুরুত্ব পাবে না—ফলে পুরো ব্যাপারটাই হয়ে পড়বে অবাস্তব, অবাঞ্ছিত।'

বাংলা সরকারের মুখ্যসচিব বিনা মন্তব্য তুলে ধরেছিলেন প্রাদেশিক রাজ্যপালের মতামত :

'মাননীয় রাজ্যপালের মতে কেন্দ্রীয় সেন্সার-পর্যদ গঠনের প্রস্তাবটি অবাস্তব, দেরীর কারণেও বটে, তাছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের বাস্তব অবস্থার বৈচিত্র্যের কারণেও বটে।'

এইভাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যাপারটি নিয়ে আর বেশিদূর এগোন নি। তাঁদের সামনে ছিলো সংবিধানেরও বাধা। সিনেম্যাটোগ্রাফ অ্যাক্ট এর (১৯১৮) যে-সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার সেন্সারব্যবস্থার ওপর প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন (হোক্ তা রাজ্যপালের 'সংরক্ষিত' ক্ষমতার আওতায়)। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে দ্বিতীয়বার সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হতো। কেন্দ্রীয় প্রশাসন সেপথে আর গেলেন না। সেন্সারপ্রথায়, সাময়িকভাবে হলেও, আপাত-স্থিতাবস্থা বজায় থাকলো।

এসব সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে সেন্সারপ্রথা নিয়ে চাপ, প্রস্তাব, প্রশ্ন ও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে ভারতের বৃটিশ প্রশাসনকে। বিধায়করা প্রশ্ন তুলেছেন আইন প্রণয়ন পরিষদে (লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলী বা কাউন্সিল অব স্টেট-এ), এমনকি খোদ লণ্ডন-এর

পার্লামেণ্ট-এও। তাছাড়া জনমতের প্রতিফলন হতো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায় অথবা প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির প্রতিবেদনে।

ভারতীয় আইন পরিষদে কেন্দ্রীয় একটি সেন্সার-পর্ষদ গঠনের প্রশ্ন উঠেছিল আরো তিনবার।

কাউন্সিল অব স্টেট-এর সদস্য স্যর ইব্রাহিম হারুণ জাফর প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মনোনীত এবং অবৈতনিক সদস্যদের নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক পর্ষদগুলি ভেঙে দিয়ে সারা (বৃটিশ) ভারতের জন্যে একটি বেতনভুক পর্ষদ নিয়োগ করা হোক্ যাঁরা ভারতে চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন ভারতে ছবি আমদানীর ওপর। আঞ্চলিক পর্ষদগুলির বিচারপদ্ধতিতে তারতম্যের ব্যাপারটি লক্ষ্য করে তাঁর মনে হয়েছিল, ভারতে পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা যেসব ছবি দেখানো হয় তাদের দৌলতে পাশ্চাত্য সমাজজীবন সম্পর্কে এদেশের লোকদের মনে সম্পূর্ণ ভুল একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে আমেরিকান ছবির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন :

> 'আমার মনে হয় আমেরিকার কিছু প্রযোজক ভারত বা জাপানের মতো প্রাচ্যের কিছু দেশের জন্যেই বিশেষ করে ছবি তৈরি করেন, এবং সেসব এমন ছবি যেগুলো তাঁরা আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ড-এ দেখাতে সাহসই পাবেন না।.... আমি এ-ও বিশ্বাস করি, যদি কোনো ছবি অতিরিক্ত যৌন-ইঙ্গিতবাহী হওয়ার জন্যে আমেরিকায় সেন্সার-পর্ষদের নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে তাহলে পত্রপাঠ সেটিকে ভারতের মতো কোনো দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গোপনে, কেননা সেখানে এখনো পর্যন্ত প্রশাসন এসব ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন নি।'

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সরকারী সচিব মিঃ জে. ক্রেরার স্যর জাফরের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন যে, প্রথমত, সেন্সার-

ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, সংবিধান অনুসারে, প্রাদেশিক সরকারের হাতে; দ্বিতীয়ত, ভারতের মতো একটি দেশে সংবেদনের অঞ্চলভিত্তিক তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক এবং আঞ্চলিক পর্ষদগুলির অস্তিত্ব এই অবস্থার সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ। মিঃ ক্রেরার-এর বক্তব্যের প্রথমাংশ খুব যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও তাঁর আপত্তির জোরেই স্যর জাফরের প্রস্তাবটি সভায় অগ্রাহ্য হয়ে যায় (১৯২৬ সালের ২২ জানুয়ারী)।

লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী-তে খান বাহাদুর সরফরাজ হুসেন আরো দুবার (ফেব্রুয়ারী ২, ১৯২৫ আর মার্চ ১৫, ১৯২৭) কেন্দ্রীয় সেন্সার-পর্ষদের দাবি তুলেছিলেন। তিনিও দাবি আদায়ে ব্যর্থ হন।

সেন্সারপ্রথা নিয়ে উত্তেজনা অবশ্য অব্যাহত থাকে। ১৯২৭ সালের ২১ মার্চ কাউন্সিল অব স্টেট-এ মাননীয় সদস্য শ্রী ভি. রামদাস পান্তলু চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর ওপর আরো কঠোর এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি প্রয়োগ করার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন রাখেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি প্রধানত আমেরিকা থেকে আসা ছবিগুলির নিন্দা করেন যেগুলিতে থাকতো 'জনসাধারণের নীতিবোধ দূষিত করার মতো দৃশ্য'। শ্রী পান্তলুর বক্তব্য সমর্থন করে ডঃ ইউ. রামারাও ভারতের বুকে ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা আর নৈতিক অবনতির জন্যে চলচ্চিত্রের কুপ্রভাবকে দায়ী করলেন। তিনি এ-ও বললেন যে, ছবির পর্দায় ন্যাক্কারজনক প্রেমদৃশ্য দেখে যুবসমাজ বিপথগামী হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ এইচ. জি. হ্যেগ শ্রী পান্তলুর উদ্বেগকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, সেন্সারপ্রথার উন্নতিসাধন অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু তিনি সেন্সার-পর্ষদগুলির কাজকর্মে উল্লেখযোগ্য কোনো ত্রুটি খুঁজে পান নি। তাঁর যুক্তি: যে সব ছবি ভারতে দেখানো হয়, সেগুলি কোনো-না-কোনো বিদেশী সভ্যতার প্রতিনিধি এবং উপজীব্য বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয় খুবই স্থূল কিছু পদ্ধতির সাহায্যে; এসবের যাঁরা দর্শক,

তাঁরা প্রায়শই উপস্থাপিত দৃশ্যবলীর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে পারেন না ; এর জন্যেই সিনেমার প্রভাব নির্ধারণ করা এত শক্ত হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য রীতিনীতির উপস্থাপনা পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে কতখানি সহনীয়, কেবল এটুকুই তো আর সেন্সার-এর বিচার্য নয়, সমস্ত জিনিসটিকে তাঁদের বিচার করতে হবে প্রাচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে, এমনকি সম্ভাব্য ভুলত্রুটির প্রসঙ্গটি মাথায় রেখে।—মিঃ হ্যেগ বিশ্বাস করতেন, আমদানী করা ছবির মধ্যে বৃটিশ ছবির অনুপাত যদি বাড়ানো যায়, তাহলে সেন্সার-পর্ষদগুলির কাজ আরো সহজ হবে। কিন্তু, একথাও তিনি বলেছিলেন যে, সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় ভারতীয় ছবির উৎপাদন যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করা।

এর ঠিক চারমাস পরে (জুলাই ১১, ১৯২৭), বৃটিশ পার্লামেন্ট-এর সদস্য লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল হাওয়ার্ড-বেরি তদানীন্তন ভারত-বিষয়ক উপসচিব আর্ল উইণ্টারটন-কে জিগ্যেস করলেন, বিশেষ ধরনের কিছু আমেরিকান ছবির বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিনা এবং সেগুলি যাতে ভারতে দেখানো না যায় তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা। এর উত্তরে আর্ল উইণ্টারটন জানালেন যে, ভারত সরকারের কাছে পাঠানো এক বার্তায় (মার্চ ৩১, ১৯২৭) সেন্সারব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বিশেষ করে নজর দিতে বলা হয়েছে পাশ্চাত্যের (মূলত আমেরিকার) ছবিগুলির প্রদর্শনযোগ্যতার ওপর। তবে, ভারত সরকারের কাছ থেকে তখনো কোনো উত্তর না-পাওয়ার দরুণ, আর্ল উইণ্টারটন বলতে পারেন নি যে সেন্সারব্যবস্থার প্রচলিত কাঠামো শক্তিশালী করার কোনো উদ্যোগ ভারতে নেওয়া হয়েছে কিনা।

লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল হাওয়ার্ড-বেরির পাল্টা প্রশ্ন :

'অবাঞ্ছিত ছবির ক্ষতিকর প্রভাবের সূত্রে ভারতে জনমত যে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ, তা কি লর্ড মহাশয় জানেন ?'

আর্ল উইণ্টারটন :

'জানি; তবে সেই বিক্ষোভের মাত্রা এদেশে প্রকাশিত বিক্ষোভ-বিক্ষোভের চেয়ে বেশি নয়। সমস্যাটা খুবই জটিল—চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের একটা কার্যকর উপায় আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।'

এই প্রশ্নোত্তরের মাঝখানে অন্য একজন সদস্য কর্নেল ড্যে-র প্রশ্ন:

'ভারতে সর্বশেষ যে ছবিটি নিষিদ্ধ হয়েছে, সেটি কোনো আমেরিকান ছবি নয়, বরং একটি বৃটিশ ছবি—একথা কি লর্ড মহোদয় অবগত আছেন?'

আর্ল উইন্টারটন-এর অকপট স্বীকারোক্তি:

'আমি ঠিক জানি না, তবে যা-ই হোক্, ছবিটি যে অবাঞ্ছিত সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।'

'অবাঞ্ছিত' এই ছবির নাম তিনি পরে জানতে পেরেছিলেন নিশ্চয়ই। এব্যাপারে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সে-তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে একথা জানতে পেরে আজ আমাদের কিঞ্চিৎ কৌতুকবোধ হয় যে, 'দ্য হাঞ্চব্যাক অব নোৎরডাম' নামের এই বৃটিশ ছবিটি যে-আশঙ্কার ভিত্তিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল ('ছবিটি জনসাধারণের এক উল্লেখযোগ্য অংশের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হানতে পারে') মাননীয় সংসদ-সদস্যরা বিতর্কের সময়ে ঠিক সেই আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলেন না—হতে পারে, তাঁদের হাতেও ছিলো অপ্রতুল তথ্য। তাঁদের আলোচনার মূল বিষয় ছিলো আমেরিকার ছবিতে প্রতিফলিত শিথিল নৈতিক মূল্যবোধ। প্রশ্নটা অতএব শ্লীল-অশ্লীলের মাত্রা নির্ধারণের।

গূঢ়তর কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে কি এই আলোচনার পেছনে? হলিউড-এর ছবিতে যে শিথিল নৈতিক মানদণ্ডের প্রতিফলন হয়, এই অভিযোগ তো উঠেছে ১৯১৯-২০ সালেও। ভারতে কঠোর সেন্সারব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্যতম 'অনুপ্রেরণা'-ই ছিলো এই অভিযোগ। ছ-সাত বছর যেতে না যেতেই আবার কেন পুরনো

বিষয়ের চর্বিতচর্বণ? তা-ও যখন এদেশের সেন্সারব্যবস্থায় পুরোপুরি গা-ত এসে গেছে! বিষয়টি বুঝবার জন্যে আমাদের সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিতে হবে।

১৯২১-২২ সালে ভারতে যে ১,৩২০টি ছবি দেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র ৬৪টি ছবি ভারতে তৈরি। ১৯২৩ সালে ভারতে চলচ্চিত্র আমদানীর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটার্স-এর আমদানী করা ছবির ৯০ শতাংশই ছিলো আমেরিকার। ১৯২৬-২৭ সালে এদেশে যত ছবি দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে ৮৫ শতাংশই ছিলো বিদেশী—সেসবের ৯০ শতাংশ আবার আমেরিকায় তৈরি। এক-কথায়, পুরো তৃতীয় দশক (১৯২০-১৯২৯) জুড়ে ভারতে প্রদর্শিত ছবির ৮০ শতাংশই ছিলো আমেরিকার ছবি —এবার আর-একটি হিসেব :[১]

	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
১. ভারতে আমদানা করা ছবির দৈর্ঘ্য (ফুট)	৪,১৪৯,৩২৮	৫,২১৮,৬৪৩
২. আমেরিকা থেকে আমদানী করা ছবির দৈর্ঘ্য	৩,২২৭,৮০৭	৪,১৫৯,৫৪৮
৩. বৃটেন থেকে আমদানী করা ছবির দৈর্ঘ্য	৩১০,১৪১	৩৮৭,৬২৪
৪. অন্যান্য দেশ থেকে আমদানী করা ছবির দৈর্ঘ্য	৬১১,৩৮০	৬৭১,৪৭১
৫. (১)-এর শতকরা অংশ হিসেবে (২)	৭৭.৯০	৭৯.৭২
৬. (১)-এর শতকরা অংশ হিসেবে (৩)	৭.৪৭	৭.৪২
৭. (১)-এর শতকরা অংশ হিসেবে (৪)	১৪.৭৩	১২.৮৬

৭.৫০%—গর্ব করার মতো কোনো অনুপাত নয়। মনে রাখতে হবে, প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগে (১৯১৪) সালে ভারতে যত ছবি দেখানো হয়েছিল, তার ২৫ শতাংশই ছিলো বৃটেন থেকে আনা।

মহাযুদ্ধে বৃটেন-এর অন্যান্য শিল্পের মতো ক্ষতির কবলে পড়েছিল চলচ্চিত্রশিল্পও। ১৯২৪-২৫ সালে ভারতে প্রদর্শিত ছবির মধ্যে মাত্র ৩% ছিলো বৃটেন-এর ছবি। এক বছরে সেই অনুপাত প্রায় ৭.৫%-এ চলে যাওয়াটা আপাতদৃষ্টিতে উন্নতির পরিচায়ক হলেও বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, তখনো যুদ্ধজনিত মন্দার কবল থেকে বৃটেন-এর চলচ্চিত্রশিল্প মুক্তি পায় নি। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত 'ময়েন রিপোর্ট' অনুযায়ী: ১৯২৩ সালে বৃটেন-এর চলচ্চিত্র-উৎপাদনে কিছুটা তেজীভাব দেখা যায়, যার ফলে সেবছর বৃটেন-এ প্রদর্শিত ছবির ১০ শতাংশ দেশের মাটিতেই তৈরি; কিন্তু বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখে সেই তেজীভাব আবার ঝিমিয়ে পড়ে এবং ১৯২৬ সালে বৃটেন-এ যত ছবি দেখানো হয়েছিল, তার ৫ শতাংশও বৃটেন-এ তৈরি হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের কর্ণধারদের কাছে বাজারের সমস্যাটা তখন একটা সংকটের চেহারা নিয়েছে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট-এর বাদানুবাদ (জুলাই ১৯২৭) সেই বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যারই প্রতিফলন। তাছাড়া, যখন বৃটিশ ছবির বাজার-বিস্তারে বৃটিশ সরকারের সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত বলে সেদেশের 'জনগণ' মনে করেছেন, ঠিক তখনই ভারতে বৃটিশ-আশ্রয়পুষ্ট সেন্সার-কর্তৃপক্ষের হাতে বৃটিশ ছবিকে এভাবে 'নিগৃহীত' হতে দেখে যে সংসদসদস্য কর্ণেল ডে্য-র ভ্রূকুঞ্চণ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! কর্ণেল সাহেবের কথায় তো প্রচ্ছন্নভাবে এমন ইঙ্গিতই খুঁজে পাওয়া যায় যে, আমেরিকার কোনো ছবির ক্ষেত্রে এরকম কিছু হলে তাঁর এতখানি মাথাব্যথা থাকতো না।

ভারতে প্রচলিত সেন্সারব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হয়েছিল যে বৃটিশ 'জনমত', আমরা দেখবো, তা-ও ছিলো আসলে বৃটেন-এর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।—প্রথম মহাযুদ্ধের পর এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে এরপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপ-এর দেশগুলিকে অনেক পেছনে ফেলে দেবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইওরোপ-এর অর্থনীতিতে আমেরিকার বাণিজ্য ও শিল্প-পুঁজির ব্যাপক অনুপ্রবেশ শুরু হলো তৃতীয় দশক (১৯২০-২৯) থেকে। এশিয়া-আফ্রিকায় ইওরোপীয় দেশগুলির যেসমস্ত উপনিবেশ ছিলো, সেখানেও আমেরিকান পুঁজি তার ব্যাপক উপস্থিতি জাহির করলো সাড়া জাগিয়েই। এককথায়, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নেতৃত্ব চলে গেলো আমেরিকার হাতে। চলচ্চিত্রক্ষেত্রে তখন হলিউড-এর স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছে। বিরাট মূলধন সম্বল করে পাঁচটি প্রধান চলচ্চিত্র-সংস্থা চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের তিনটি ক্ষেত্রেই তাদের প্রাধান্য বিস্তারে তৎপর হয়েছে। কারখানায় যেমন ব্যাপকহারে পণ্য উৎপাদন হয়, এই পাঁচটি সংস্থা চলচ্চিত্র-উৎপাদনেও সেই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই গণ-উৎপাদনের প্রতিক্রিয়া যে সারা বিশ্বের বাজারেই পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কী! শুধু বৃটেন কেন, অন্য কোনো দেশের চলচ্চিত্র-উদ্যোগই তখন এতটা সংগঠিত এবং সংহত নয় যে এই স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দেবে। তবু বিক্ষুব্ধ হয়েছে বৃটেন-এর 'জনমত'। এখানে লক্ষ্য করার, মতামত এসেছে কেবল সমাজের ওপরতলার লোকজনদেরই কাছ থেকে।

১৯২৩ সালের ২৩ আগস্ট লণ্ডন-এর 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ :

> 'প্রাচ্যে আমাদের যেসব উপনিবেশ আছে সেখানকার অধিবাসীরা সাধারণভাবে যেসমস্ত ছবি দেখে, সেগুলি স্থানীয় বৃটিশ নাগরিকদের চরম বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছে। ভারতে বা আমাদের অন্যান্য উপনিবেশে যেসব ছবি (বিদেশ থেকে) পাঠানো হয়, সেগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে প্রদর্শনের অযোগ্য। ছবিগুলি হয় প্রত্যক্ষত ক্ষতিকারক, কেননা হিংসা বা কামাবেগের প্রদর্শনীতে

সেগুলি ভরপুর, অথবা পরোক্ষ ক্ষতির উৎস, যখন সেগুলিতে প্রতিফলিত হয় শ্বেতাঙ্গ মানুষের বুদ্ধিহীনতা অথবা দুষ্কার্য। উপনিবেশের বাসিন্দাদের মানসিক বৃত্তিগুলি খুব পরিণত নয়। ফলে গড়পড়তা সিনেমাদর্শকের মানসিক বিকাশের স্তর তাদের শারীরিক বিকাশের সমকক্ষ নয়। আর তারাই দেখে আমেরিকান স্টুডিওয় তৈরি 'যৌন চলচ্চিত্র' এবং এমন সব ছবি যেগুলিতে হিংসাই হলো প্রধান উপজীব্য। এ দুয়ের মাঝখানে হয়তো গুঁজে দেওয়া হচ্ছে এক-আধটা হাসির ছবি, যেগুলি কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষের হাস্যকর কার্য-কলাপে ভর্তি। এসবের ফল যা হবার, তা-ই হয়েছে। কয়েকদিন আগে জনৈক রাজকর্মচারীর স্ত্রীকে নেটিভরা যে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই ঘটনায় এটা প্রমাণ হয়েছে যে নেটিভরা বিশেষ একটি ছবির হিংসাত্মক দৃশ্যাবলী থেকে এই দুষ্কার্যের অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।'

১৯২৬ সালে আহূত কোনো সম্মেলনে জনৈক ধর্মযাজক মন্তব্য করেছিলেন, ভারতে প্রদর্শিত অধিকাংশ ছবিই আসে আমেরিকা থেকে এবং সেগুলি রোমাঞ্চকর আর দুঃসাহসী হত্যাকাণ্ড, দুষ্কৃতি অথবা বিবাহবিচ্ছেদে ভরপুর; এসব ছবির প্রভাবে ভারতীয়দের চোখে শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

আমেরিকান ছবি সম্পর্কে বৃটিশদের উদ্বেগের আসল তাৎপর্য অবশ্য পরিষ্কার হয়ে গেলো 'বোর্ড অব ট্রেড'-এর কাছে পেশ করা 'ফেডারেশন অব বৃটিশ ইণ্ডাস্ট্রীজ'-এর প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে বলা হলো, বৃটিশ পুঁজিপতিদের উদ্বেগ এবং আপত্তির মূল লক্ষ্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় 'বিদেশী' চলচ্চিত্র-সংস্থার প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা। আরো বলা হলো, এই একচেটিয়া ব্যবসা বৃটিশ মর্যাদার পক্ষেই শুধু ক্ষতিকর নয়, সাধারণভাবে তা সাম্রাজ্যের স্বার্থকেও ক্ষুণ্ণ করছে, বিশেষত সেইসব উপনিবেশে যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষজনের

বাস। ফেডারেশন চাইলেন, বিষয়টি পরবর্তী 'ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স'-এ আলোচিত হোক্।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের একাংশ ততদিনে চলচ্চিত্রের অর্থকরী সম্ভাবনার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেছেন। ফেডারেশন-এর এই প্রতিবেদনটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করলেন স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাষায়।

মাদ্রাজ-এর 'দ্য ইণ্ডিয়ান ডেয়েলি মেল' পত্রিকায় ১৯২৬ সালের ২২ এপ্রিল প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হলো :

'বোর্ড অব ট্রেড-এর কাছে ফেডারেশন অব বৃটিশ ইণ্ডাস্ট্রীজ যে বক্তব্য দাখিল করেছেন, তাতে ভারতের একমত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ফেডারেশন-এর উদ্বেগের কারণ আমরা বুঝতে পারি—গত কয়েক বছরের মধ্যেই চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং প্রদর্শনী একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোদ্যোগের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে আসে প্রচুর মুনাফা এবং যেখানে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়। তবে কথা হলো, অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের চেয়ে সিনেমার ব্যাপারটা আলাদা, কেননা প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে এর একটা গুরুত্ব আছে। আর, এই বিষয়েই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে ফেডারেশন। তাদের বক্তব্যে এটাই মনে হয় যে আমেরিকায় তৈরি ছবিগুলি শ্বেতাঙ্গদের মর্যাদারক্ষার বিষয়টিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না—বরং তাকে বেশ খারাপভাবেই দেখানো হয়, তার দুর্বলতা এবং বদগুণগুলিকে অতিরঞ্জিত করে। ফেডারেশন-এর ভয় হলো, এরকম চলতে থাকলে শ্বেতাঙ্গদের বিষয়ে অশ্বেতকায়দের মনে যে ভীতি এবং শ্রদ্ধা অবশিষ্ট আছে তা সমূলে উৎপাটিত হবে; অথচ ভয়মিশ্রিত সেই শ্রদ্ধাই ফেডারেশন-এর মতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি। বৃটিশ ছবিকে সরকারী তরফে উৎসাহ দেওয়া উচিত বলে

ফেডারেশন যে দাবি করেছে, তার সপক্ষে সবচেয়ে দুর্বল যুক্তিটিকেই তারা দাঁড় করিয়েছে! সিনেমাহলে লোকে যায় আমোদিত হতে, বৃটেন বা অন্য কোনো দেশের শৌর্য, বীর্য, যশ বা গৌরবের সুধাপান করতে নয়। দর্শকের গায়ের রঙের ভিত্তিতে চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের এই দাবি আদৌ যুক্তি-সঙ্গত নয়, যেমন যুক্তিসঙ্গত নয় পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্বলতা নিয়ে লেখা বইপত্রের প্রচার সীমিত করার চেষ্টা। অশ্বেতকায় দর্শকেরা যেসব সিনেমা দেখবে, তাতে শ্বেতাঙ্গ মাত্রেই সমস্ত দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে থাকবে এবং তার একমাত্র কর্তব্য হিসেবে অশ্বেতকায়দের শান্তি আর সুনীতির পথ দেখাবে, এটাই যদি ফেডারেশন-এর দাবি হয় তাহলে কার্যক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা অনিবার্য।'

১৯২৬ সালের ২১ এপ্রিল বোম্বাই-এর 'দ্য টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকাও 'ফোডারেশন'-এর প্রতিবেদনটির সমালোচনায় এগিয়ে এলো। পত্রিকা ভারতের বাজারে আমেরিকান ছবির একচেটিয়া প্রাধন্যের জন্যে দায়ী করলো বৃটেন-এর চলচ্চিত্রশিল্পের কর্ণধারদেরই :

'(ভারতের মতো) একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজারের অধিকার যে আমেরিকার হাতে চলে গেলো, তার জন্যে দায়ী বৃটিশ পুঁজিপতিদের ব্যবসায়িক ব্যর্থতা। আমেরিকান ছবির মোকাবিলা করতে হবে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতারই সাহায্যে। লোকদেখানো সাম্রাজ্যের হিতাহিতের প্রশ্ন তুলে সেগুলিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হবে চরম মূর্খামির পরিচয়।'

দুটি পত্রিকাই এবিষয়ে একমত হলো যে, ভারতীয় দর্শক যাতে ভারতীয় ছবিই আরো বেশি করে দেখার সুযোগ পান, বৃটিশ সরকারের উচিত হবে সেদিকেই নজর দেওয়া।

ভারতে চলচ্চিত্রক্ষেত্রের অধিকার নিয়ে আমেরিকান, বৃটিশ এবং ভারতীয় পুঁজিপতিদের এই দ্বন্দ্বে 'ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স' বলা

বাহুল্য বৃটিশ পুঁজিপতিদের পক্ষ নেয়। ১৯২৬ সালের সম্মেলনে দুটি প্রস্তাব নেওয়া হলো :

১) সাম্রাজ্যের মধ্যে 'বহিরাগত' ছবির ক্ষেত্রে উচ্চহারে আমদানী-শুল্ক প্রবর্তন।

২) অভ্যন্তরীণ পুঁজির সাহায্যে নির্মিত ছবির জন্যে সাম্রাজ্যের মধ্যে অবাধ বিচরণের অধিকার।

ভারতীয় প্রশাসন অবশ্য 'ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স'-এর এইসব প্রস্তাব কার্যকর করতে খুব উৎসাহ দেখান নি। এমন নয় যে আমেরিকান ছবির একচেটিয়া বাজার খর্ব করতে বা বৃটিশ ছবির বাজার বিস্তারে সাহায্যে করতে তাঁদের খুব আপত্তি ছিলো। বরং বিষয়টিকে আর একটু তলিয়ে দেখার জন্যে ভারতীয় চলচ্চিত্রক্ষেত্র সম্পর্কে একটা ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন তাঁরা। স্থানীয় চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের শক্তি এবং দুর্বলতার যথাযথ মূল্যায়নও ছিলো জরুরী।

এই উপলব্ধির বাস্তব রূপায়ণ হলো 'দ্য ইণ্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটি ১৯২৭-২৮' নিয়োগের মাধ্যমে।

৭. পর্যালোচনা

'ইণ্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটি ১৯২৭-২৮' ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় অধ্যায়। ১৯২৭ সালের ৬ অক্টোবর ভারতীয় প্রশাসনের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এক প্রশাসনিক ঘোষণায় গভর্নর জেনারেল (লর্ড আরউইন) কর্তৃক এই কমিটির নিয়োগের কথা প্রকাশ করেন। কমিটির বিবেচ্য হিসেবে তিনটি বিষয়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল :

ক) ভারতে সেন্সারব্যবস্থার বিভিন্ন সংগঠন এবং সেগুলির নীতি-পদ্ধতি বিষয়ে অনুসন্ধান ;

খ) ভারতে চলচ্চিত্র-উৎপাদন এবং প্রদর্শনের সংস্থাগুলি বিষয়ে সমীক্ষা ;

গ) সাধারণভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যে তৈরি ছবির প্রদর্শনী এবং ভারতীয় ছবির উৎপাদন ও প্রদর্শনীতে বিশেষ উৎসাহপ্রদান কর্মসূচীর যাথার্থ্য বিচার এবং সেসম্পর্কে সুপারিশ।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট-এর অ্যাডভোকেট শ্রী টি. রঙ্গচারিয়ার নিযুক্ত হলেন কমিটির সভাপতি। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে মনোনীত হলেন আরো পাঁচজন—

১. স্যর ইব্রাহিম হারুণ জাফর, কাউন্সিল অব স্টেট-এর সদস্য,

২. শ্রী কে. সি. নিয়োগী, কলকাতা হাইকোর্ট-এর অ্যাডভোকেট এবং প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর সদস্য,

৩. কর্ণেল জে. ডি. ক্র্যাফোর্ড, সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর সদস্য,

৪. মিঃ জে. কোট্ম্যান, সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর সদস্য এবং জনশিক্ষা অধিকর্তা, এবং

৫. মিঃ এ. এম. গ্রীন, বোম্বাই বন্দরের শুল্ক-অধিকর্তা এবং স্থানীয় সেন্সার-পর্ষদের সদস্য।

এই কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রক্ষেত্রের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়ে এক ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। প্রায় ৯,৫০০ মাইলের পথ-পরিক্রমায় ১২টি শহরে গিয়েছিলেন কমিটির সদস্যেরা।[১] চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত অথবা সমাজে মাননীয়, এমন ৩৫৩ জন এসে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে গেছেন কমিটির সামনে।[২] এছাড়াও মোট ৪,৩২৫টি মুদ্রিত প্রশ্নমালা কমিটি পাঠিয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠনের কাছে। ৩২০টি উত্তর শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল কমিটির দপ্তরে। তাঁদের এই অনুসন্ধান কর্মযজ্ঞে খরচ হয়েছিল মোট ১,৯৩,৯০০ টাকা। চলচ্চিত্র নিয়ে এত বিশদ অনুসন্ধান আজ পর্যন্ত হয়নি এদেশে। কমিটির অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে—'রিপোর্ট অব দ্য ইণ্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটি ১৯২৭-২৮' নাম দিয়ে। কমিটির যাবতীয় অনুসন্ধানের নির্যাস এবং সদস্যদের মতামত প্রকাশিত হয়েছে এই প্রতিবেদনে। এরই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে চার খণ্ডের সাক্ষ্যবিবরণী 'এভিডেন্সেজ, ইণ্ডিয়ান সিনেম্যা-টোগ্রাফ কমিটি ১৯২৭-২৮' নামে। মোট ৬৭৩টি লিখিত মৌখিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এটি সংকলিত।[৩]

সরকার-নিযুক্ত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনগুলি সাধারণত সুখপাঠ্য হয় না। সেদিক থেকে দেখলে ইণ্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটির প্রতিবেদন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। মূল প্রতিবেদনে তো বটেই, এমন কি সাক্ষ্যবিবরণীতে প্রশ্ন করার কৌশল থেকেও এটাই বোঝা

যায় যে কমিটির সদস্যেরা প্রত্যেকেই সমসাময়িক চলচ্চিত্রজগৎ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। এব্যাপারে অবশ্য সহযোগী পাঁচ সদস্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন চেয়ারম্যান শ্রীরঙ্গচারিয়ার স্বয়ং। শুধু জ্ঞানের বহর দিয়েই নয়, নিজের তীক্ষ্ণ রসবোধ এবং পেশাগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি সাক্ষ্য-অধিবেশনকে তিনি সজীব করে তুলতেন এবং বার করে আনতেন অদ্ভুত সব তথ্য। আপাত-দৃষ্টিতে এগুলির অধিকাংশই হয়তো গুরুত্বহীন, কিন্তু এসবের একত্র সন্নিবেশে কমিটির প্রতিবেদনটি হয়ে উঠেছে তৎকালীন চলচ্চিত্র-জগতের এক প্রামাণ্য এবং অসামান্য দলিল। —'ভারতের চলচ্চিত্র-নির্মাণ এবং (ভারতীয় ছবির) প্রদর্শন-ব্যবস্থার পর্যালোচনা' ছিলো কমিটির অনুসন্ধানক্ষেত্রের এক-তৃতীয়াংশ। বৃটিশ প্রশাসন আসলে চেয়েছিলেন ১৯২০ সালে প্রবর্তিত সেন্সারব্যবস্থার পর্যালোচনা আর ভারতের বাজারে আমেরিকান ছবির 'দৌরাত্ম্য' বিষয়ে যাবতীয় তথ্য। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কোনো কিছু নিয়েই তাঁদের মাথাব্যথা ছিলো না। অথচ কমিটি সেই ব্যাপারেই যেন অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন বেশি করে। সম্ভবত ব্যাপারটা প্রশাসনের মনঃপুত হয়নি। ফলে কমিটির বিপুল পরিশ্রমলব্ধ প্রতিবেদনটি যে শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেই থেকে গেলো, গূঢ় প্রশাসনিক আকাঙ্ক্ষাপূরণে প্রতিবেদনটির ব্যর্থতা এব্যাপারে অন্য অনেক কারণের মধ্যে প্রধান একটি হিসেবে গণ্য হবে। সরকারী উপেক্ষা অবশ্য প্রতিবেদনটির ঐতিহাসিক মূল্যকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

চলচ্চিত্রক্ষেত্র যে ফাট্‌কাবাজির জায়গা, এ-ধারণা শেকড় গেড়েছিল ভারতীয় চলচ্চিত্র-ইতিহাসের একেবারে আদিপর্বে। জায়মান এই শিল্পক্ষেত্রে (ইণ্ডাস্ট্রী-অর্থে) পুঁজি-বিনিয়োগের স্থায়িত্ব বা মাত্রা, কোনো কিছুই ছিলো না নির্দিষ্ট, নিশ্চিত। অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের

ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর নির্দিষ্ট কিছু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকে; কিন্তু ভারতের চলচ্চিত্র-প্রযোজকদের ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশই সেরকম কিছু লক্ষ্য বা পরিকল্পনা নিয়ে এক্ষেত্রে এসেছিলেন। প্রযোজকদের অধিকাংশই বিনিয়োগ করতেন চট্‌জলদি মুনাফার লোভে। ফলে এই শতকের তৃতীয় দশকে (১৯২৯-২০) ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল চলচ্চিত্র প্রযোজনা-সংস্থা—কলকাতা, বোম্বাই আর মাদ্রাজ ছাড়াও কোলাপুর, পুনে, হায়দ্রাবাদ, লখ্‌নউ, গয়া, দিল্লী, লাহোর, আমেদাবাদ, পেশোয়ার, সেকেন্দ্রাবাদ বা নাগেরকয়েল-এর মতো শহরেও। একটি, তুটি বা বড়জোর তিনটি ছবি প্রযোজনার পরেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলতেন এইসব জায়গার প্রযোজকেরা, যাঁরা ছিলেন মূলত সখের প্রযোজক। এঁদের আসা-যাওয়ায় পুঁজির জোগান যত অনিশ্চিত হচ্ছিল, ততই অধোগামী হচ্ছিল ছবির উৎকর্ষ। অবস্থা দেখে কমিটি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, '...... সরকারের উচিত প্রযোজকদের জন্যে অল্প সুদে এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধ-কার্যক্রমে, তৈরি হয়ে যাওয়া ছবির জামানতের ভিত্তিতে, ঋণদানের ব্যবস্থা করা'।

কত খরচ হতো তখন একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করতে? বোম্বাই-এর প্রযোজকেরা তাঁদের সাক্ষ্যে বলেছেন, গড়ে প্রায় ২০,০০০ টাকা। কলকাতা-মাদ্রাজের প্রযোজকেরা অবশ্য ১৫,০০০ টাকাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে কয়েকটি মাত্র স্থায়ী প্রযোজনা-সংস্থা ছিলো, যাঁরা নিজেদের ষ্টুডিও এবং ল্যাবরেটরী তৈরি করেছিলেন। এইসব ব্যবস্থা অবশ্য এমন-কিছু উন্নতমানের ছিলো না।

চলচ্চিত্র-প্রদর্শনেও অবস্থা ছিলো সমান খারাপ। কমিটি লক্ষ্য করেছেন, ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থায়ী সিনেমাহলের সংখ্যা ১৫০ থেকে বেড়ে ২৬৫-তে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এখানে স্থায়ী

বিনিয়োগের রাস্তা খুলে গিয়েছিল। আসলে হলগুলির মালিকানায় ক্রমাগত হাতবদল হতো।

অনুসন্ধানের সূত্রে কমিটি জানতে পেরেছিলেন, ভারতীয় প্রযোজকেরা সাধারণত একটি ছবির তিনটি করে প্রিণ্ট তৈরি করাতেন সিনেমাহলে বণ্টনের জন্যে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনো কোনো প্রযোজক অবশ্য সর্বোচ্চ দশটি প্রিণ্টও তৈরি করেছেন বলে জানা যায়। এক-একটি প্রিণ্ট-এ সাধারণত তিন-চারটি ভাষায় সাবটাইট্‌ল্ ও টাইট্‌ল্ থাকতো তখন। মনে রাখতে হবে, সেটা ছিলো নির্বাক ছবির যুগ। উত্তর ভারতে বণ্টনের জন্যে যে প্রিণ্ট দেওয়া হতো, তাতে থাকতো হিন্দুস্তানী, উর্দু আর গুজরাতি ভাষার টাইট্‌ল্। দক্ষিণ ভারতে বণ্টনের জন্যে তৈরি প্রিণ্ট-এ থাকতো তামিল, তেলুগু আর ইংরাজি ভাষার টাইট্‌ল্। এমনকি নিরক্ষর দর্শকদের জন্যে অনেক হল-মালিক বেতনভুক ব্যাখ্যাকারীও নিয়োগ করতেন বলে জানা যায়। দক্ষিণ ভারতে এবং উত্তরের মুসলিম-প্রধান অঞ্চলের মেয়েরা ছবি দেখতেন খুবই কম। তবে ধর্মমূলক বা ভক্তিমূলক ছবি এলে হলে মেয়েদেরই সংখ্যাধিক্য থাকতো। আর পাশ্চাত্য ছবির প্রদর্শনীতে যে অল্পসংখ্যক মহিলা হলে থাকতেন, তাঁরা 'চুম্বনের দৃশ্যগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেন'।

সে যুগের ভারতীয় চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ না-বাড়ার আর একটি বড়ো কারণও আবিষ্কার করেছিলেন কমিটি—তা হলো চলচ্চিত্র-সমালোচনার নিম্নমান। ছবির বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার কোনো নিয়মনিষ্ঠ ধারাই তৈরি হয়নি তখনো। তখনকার সেইসব লেখায় পাওয়া যেতো না শিল্পের কোনো ব্যাখ্যা, রসবিচারের পথনির্দেশ বা নন্দনতাত্ত্বিক যুক্তি। আসলে সেই সময়ে সমালোচনার পুরো ব্যাপারটাই যে ছিলো একটা ফাঁকি, সেটা ধরা পড়েছিল বোম্বাইয়ের একজন সংবাদপত্র-সম্পাদকের জবানবন্দীতে। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি :

'সত্যি কথা বলতে কি, খবরের কাগজগুলো ছাপার জন্যে তৈরি-করা সমালোচনা-প্রবন্ধই সংগ্রহ করে প্রদর্শকদের কাছ থেকে……আর, প্রযোজব-প্রদর্শকের স্বার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা এমনভাবে জড়ানো যে মন খুলে সততার সঙ্গে কোনো ছবির সমালোচনা করার কথা আমরা ভাবতেই পারি না'।

স্বার্থের এই ঐক্য যে কোথায়, তা অবশ্য খুলে বলেন নি সম্পাদক। তবে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলি সংবাদপত্র-ব্যবসায়ীদের কাছে, আর্থিক কারণেই, খুব লোভনীয় ছিলো। কোনো 'ভুল-বোঝাবুঝি'-তে এই বিজ্ঞাপন-স্রোত ব্যাহত হয়, এটা চাইতেন না সংবাদপত্র-মালিকদের দল। ফলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের আত্মসমর্পণ।

এই ফাঁকির সূত্রপাত অবশ্য আমেরিকান ছবির পরিবেশকদের উস্কানিতেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইওরোপীয় চলচ্চিত্রশিল্পে যে অনিবার্য মন্দা দেখা দিয়েছিল, তারই সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, এবং ভারতেও, বাজার ভরিয়ে দিয়েছিলেন আমেরিকান ছবির পরিবেশকেরা। বাণিজ্যের স্বার্থে অর্থাৎ মুনাফার স্বার্থে কোনো কৌশল অবলম্বনেই তাঁদের আপত্তি ছিলো না। 'ফরমায়েশি সমালোচনা' বা 'পূর্ব-পরিকল্পিত সমালোচনা' হলো এমনই একটি কৌশল। বিদেশী ছবির পরিবেশকেরা তাঁদের বিজ্ঞাপনের খরচ কমাতেন কাগজের পাতায় 'অনুকূল' সমালোচনা প্রকাশ করিয়ে। আমেরিকার ছবি অবশ্য সেখানকার স্থানীয় বাজারেই তার বিনিয়োগের সিংহভাগ তুলে নিতো, অনেক ক্ষেত্রে পুরোটাই। বিদেশের বাজার থেকে এসব ছবির যা আয়, তার প্রায় সবটাই হতো মুনাফা। পরিবেশক-প্রদর্শকদের ভারতীয় ছবির জন্যে যত খরচ হতো, তার চেয়ে অনেক কম খরচেই তাঁরা পেয়ে যেতেন আমেরিকার ছবি। পাল্লা দেওয়ার জন্যে এঁদের অনুসৃত বাণিজ্য-কৌশলগুলিই অবলম্বন করতেন ভারতীয় ছবির প্রযোজক-পরি-

বেশকেরা। এইভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রক্ষেত্রের সামগ্রিক অবস্থা অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সেন্সারপ্রথার খুঁটিনাটি নিয়েও অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটি।

পাঁচটি আঞ্চলিক সেন্সার-পর্ষদের কার্যধারা পর্যালোচনা করে তাঁরা বুঝেছিলেন, এইসব পর্ষদের মূল লক্ষ্য মহাযুদ্ধ-পরবর্তী উত্তেজনা প্রশমনে সরকারকে সাহায্য করা। চলচ্চিত্রের আবেদন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন প্রশাসন কিছুটা যেন ভীতিরই বশবর্তী হয়েছিলেন। ছবি-প্রদর্শনের সূত্রে সামান্যতম উত্তেজনাও ছড়িয়ে পড়ুক, এটা প্রশাসন চাননি। ফলে সেন্সার-পর্ষদের গঠন এবং সেগুলির নিয়ন্ত্রণবিধিতে ছিলো চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার পরিচয়। তীব্র ভাষায় সেই রক্ষণশীলতার সমালোচনা করেছিলেন মাদুরাইয়ের আইনজীবী শ্রী এ. ভেঙ্কটরাম আয়ার :

‘সেন্সারব্যবস্থা হলো উদাসীন, সন্দেহপ্রবণ, গতানুগতিক এবং স্বেচ্ছাচারে ভরা। প্রকাশোন্মুখ প্রতিভাকে সর্বদাই তা ত্রস্ত রাখে। সেন্সারের কাজে নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রবণতা যত প্রকট, শিল্প-উৎকর্ষের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা ততটাই ক্ষীণ। এর উল্লেখেই অস্বস্তিকর নানা বিধিনিষেধের চিন্তা মনে আসে। এর ছোঁওয়ায় যে-কোনো শিল্পকর্মই হয়ে পড়ে মৃত্যুশীতল।’

কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে অবশ্য এতখানি কঠোর হতে চান নি। কিন্তু সেন্সারব্যবস্থার অন্তর্নিহিত রক্ষণশীলতা যে একটা হাস্যকর পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, তা-ও তাঁদের চোখ এড়ায়নি :

‘যদি কোনো ছবি মুসলমানদের পক্ষে আপত্তিকর হবে বলে মনে করা হয়, তাহলে তিনি (পুলিস কমিশনার, পদাধিকারবলে যিনি সেন্সার-পর্ষদের সভাপতি) পর্ষদের মুসলিম সদস্যকে পাঠাবেন প্রতিবেদন পেশ করার জন্যে। ছবিটি যদি হয় সামরিক দৃষ্টিকোণে আপত্তিকর, তাহলে

তদন্তে যাবেন সামরিক প্রতিনিধি। স্ত্রীজাতি বা শিশুদের প্রভাবিত করতে পারে, এমন ছবির বেলায় যাবেন মহিলা-প্রতিনিধি।...কলকাতা পর্ষদের জনৈক অধ্যাপক-সদস্য, যিনি বিশেষ কোনো স্পর্শকাতর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নন, লিখেছেন, যে দু-বছরে মধ্যে মোট ছবারের বেশি তাঁর ডাক পড়ে নি।'

সেন্সার-পর্ষদগুলির দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও কমিটি নীতিগতভাবে সেন্সারব্যবস্থার বিপক্ষে কোনো মতামত দেন নি। বরং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁরা ঘোষণা করেছেন :

'ভারতের মতো দেশের পক্ষে সেন্সারব্যবস্থা খুবই জরুরী। যেসব ছবি নৈতিক অবনতির পথ দেখায়, ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করে অথবা জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরি করে, সেগুলির আমদানী, উৎপাদন বা প্রকাশ্য প্রদর্শনী বন্ধ করার এটাই একমাত্র কার্যকর পদ্ধতি। বর্তমান সেন্সার-ব্যবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক ফলই দেখিয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নতিরও অবকাশ আছে।'

মূল ইঙ্গিতটি এক্ষেত্রে পর্ষদ-পরিচালক বা নিয়ন্তাদের মানসিক উদারতা (বা তার অভাব) বিষয়ে।

নৈতিকতার অবক্ষয়, ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত, গোষ্ঠীগত বা জাতিগত বিদ্বেষ গঠন অথবা রাজনৈতিক উত্তেজনায় ইন্ধন জোগাতে সিনেমার অবদান এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেন্সার-পর্ষদগুলির ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছিল কমিটি-আহূত সাক্ষ্য-অধিবেশনগুলিতে।

নৈতিকতার অবনমনে।সিনেমার অবদান প্রসঙ্গে দুটি আপত্তির কথা উঠেছিল বারবার। আপত্তিগুলো অবশ্য বিদেশী ছবিকে কেন্দ্র করেই—প্রথমত, বিদেশী ছবিতে দীর্ঘস্থায়ী প্রেমদৃশ্য, চুম্বন, সোহাগ, যৌনপ্রসঙ্গ এমনকি সঙ্গমের ইঙ্গিতগুলি ভারতীয় রীতি-ঐতিহ্যে

আঘাত করছে; দ্বিতীয়ত, তথাকথিত 'বীররস'-এর বিদেশী ছবি ভারতে অপরাধ-প্রবণতার বৃদ্ধিতে এবং বিশেষত শিশু-কিশোর মানসিকতার বিকৃতিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। প্রস্তাব এসেছিল, সেন্সার-ব্যবস্থাকে আরো কঠোর করে এই সমস্যার সমাধান করা হোক্। বিশেষ করে পাশ্চাত্যদেশীয় সাক্ষীরা আরো আশঙ্কা প্রকাশ করে-ছিলেন এই বলে যে, আমেরিকান ছবিতে তথাকথিত 'প্রেম' বা তথাকথিত 'বীরত্ব'-র প্রসঙ্গগুলি এমনভাবে থাকে যে ভারতীয়দের মনে পাশ্চাত্য-সভ্যতা বিষয়েই একটা খারাপ ধারণা তৈরি হয়; পাশ্চাত্যবাসীদের সাধারণভাবেই চরিত্র-শৈথিল্যের শিকার বলে ভাবেন ভারতীয়রা।

শেষোক্ত এই আপত্তির যাঁরা প্রবক্তা, সেইসব ইংরেজ সাক্ষীদের উদ্দেশ্যই ছিলো, আমেরিকান ছবিকে সাধারণভাবে বিপজ্জনক প্রমাণ করে ভারতে সেসব ছবির প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা এবং এই সুযোগে ইংল্যাণ্ড-এর ছবির বাজারটিকে বিস্তৃত করা। তবে 'শিথিল' সেন্সার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের এই জিহাদ কমিটির কাছে বিশেষ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। কমিটির মন্তব্য :

> 'যেসব ছবি এদেশে ছাড়পত্র পায়, সেগুলি প্রায় ব্যতিক্রমহীন-ভাবেই পরিচ্ছন্ন এবং সুস্থরুচির—সেগুলি ভারতীয় দর্শককে চরিত্রহীন করা বা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে হেয় করার কাজে নিয়োজিত, একথা বলা যায় না।....তাছাড়া পুলিস কর্তৃপক্ষও বিশ্বাস করেন, সিনেমা অপরাধের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ইন্ধন জোগায় না। এর থেকেই সেন্সারনীতির কার্যকারিতা প্রমাণিত।'

কমিটি অবশ্য নীতিগতভাবে সতর্কতা অবলম্বনের পক্ষপাতী :

> 'ছবিতে অত্যধিক শারীরিক ঘনিষ্ঠতা, সোহাগ ইত্যাদির দৃশ্য দেশের যুবসম্প্রদায়ের ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং রক্ষণশীল, সমঝদার ভারতীয়দের মনে ব্যাপারটা এক ধরনের

ভীতিরও সঞ্চার করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন, বা আবেগমথিত আলিঙ্গনদৃশ্য, বিশেষত যেগুলি 'ক্লোজ-আপ' নামক সুবিধেজনক কৌশলের সাহায্যে পরিবেশিত হয়, সেগুলিকে বর্জন বা সংক্ষেপ করার প্রয়োজন আছেই। কুরুচিপূর্ণ পোষাক, ব্যবহার বা প্রেমদৃশ্যকে আরো বেশি মাত্রায় নিরুৎসাহ করা প্রয়োজন। তা শুধু এই কারণে নয় যে এগুলি ইওরোপীয় স্বার্থ বা ভারতীয় মানসিকতার পক্ষে ক্ষতিকর। এগুলি সম্প্রদায় বা সমাজ নির্বিশেষে বয়ঃসন্ধি-প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনকেই কলুষিত করে। একথা অবশ্য বলা হচ্ছে না যে ঘৃণ্য জীবনযাপন পদ্ধতির সমস্ত দৃশ্যই নিষিদ্ধ হোক্, অন্তত যেগুলি বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী।'

নৈতিক মূল্যবোধ-সংক্রান্ত আপত্তিগুলিকে রঙ্গচারিয়ার কমিটি বিশেষ গুরুত্ব দেননি, এটা পরিষ্কার। কিন্তু রাজনৈতিক তাৎপর্য-সম্বলিত বিভিন্ন বিষয়ে সেন্সার-পর্ষদগুলির অতিসংবেদনশীলতা তাঁদের সকৌতুক মনোযোগের কারণ হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে লাহোরের এক সাক্ষ্য-অধিবেশনের এই কথোপকথনটি কৌতূহলোদ্দীপক :

'প্রশ্ন : এই প্রদেশে ইতিহাস-আশ্রিত কোনো কাজ করতে গেলে খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন, তাই তো?

উত্তর : নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন : আধুনিক ইতিহাসের উল্লেখ থেকে বিরত থাকাই উচিত?

উত্তর : অন্তত কিছুদিনের জন্যে তা-ই হওয়া দরকার।

প্রশ্ন : সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কারণে?

উত্তর : ১০০০ খৃস্টাব্দের পরবর্তী ইতিহাসের যে-কোনো অধ্যায়ই খুব সমস্যাসংকুল হবে এক্ষেত্রে।'

এক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতা লাহোর সেন্সার-পর্ষদের সদস্য।—ইতিহাস-

কথনে রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠে আসা বিচিত্র বা অসম্ভব কিছু তো নয়। সাক্ষ্যদাতার ভয়, কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রসঙ্গেও সেন্সার-কর্তৃক আপত্তিকর রাজনৈতিক তাৎপর্য আবিষ্কারের বিভিন্ন উদাহরণ নিয়ে সেন্সার-পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কমিটি। প্রায় সবকটি ক্ষেত্রেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এইসব আপত্তির দুর্বল ভিত্তি বা অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করে দিতে পেরেছিলেন তাঁরা। একটি উদাহরণ—

'প্রশ্ন : এবারে আসুন ক্রমতালিকার ৭৬৪০ নম্বরে, পৃ ৩৩—'ব্রাইট শাল' ছবির প্রসঙ্গে; বাদ দিতে বলা হচ্ছে একটি সাবটাইট্‌ল্, 'দেশপ্রেমই ছিলো আমার হতভাগ্য ভাইয়ের একমাত্র অপরাধ।' এতে আপত্তির কী ছিলো ?

উত্তর : আমার মনে হয়, পরিপ্রেক্ষিত-নিরপেক্ষভাবে নিছক কিছু মন্তব্যের ভিত্তিতে এসবের বিচার করা অর্থহীন।'

উত্তরের মধ্যে একটা আপাত-যুক্তিগ্রাহ্যতা থাকলেও আসলে এটা উত্তরদাতার একটা মরিয়া চাল। প্রশ্নকর্তা যে তাঁকে একটা কোণঠাসা অবস্থায় ঠেলে দিয়েছেন, একথা বুঝতে পেরেই তাঁর এই প্রতিক্রিয়া।

কমিটি অবশ্য এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, রাজনৈতিক প্রসঙ্গে সেন্সার-পর্ষদগুলির অতিরিক্ত সংবেদনশীলতায় ভারতীয় চলচ্চিত্র-নির্মাতারা তেমনভাবে আলোড়িতই হননি, কার্যকর কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা তো দূরে থাক্। রাজরোষের ভয়ে—এবং ব্যবসা হারানোর ঝুঁকে না নিয়ে—তাঁরা বরং সেন্সার-পর্ষদের হুকুমনামাগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদাই দিতেন। উদাহরণ, জনৈক ভারতীয় প্রযোজকের সাক্ষ্য :

'প্রশ্ন : আপনাকে বাদ দিতে বলা হয়েছিল এইরকম একটি সাবটাইট্‌ল্—'হা ভগবান, বরাবরই আমি একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু এখন মনে হয়, শান্তির পথগুলিই গেছে হারিয়ে। আমায় তুমি পথ দেখাও।' ....আপনার কি মনে হয় কোনো ইংরেজ বা আমেরিকান পরিচালক এই নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতেন ?

উত্তর : আমার তো মনে হয় তিনি বিরক্তই হতেন।'

ভারতীয় চলচ্চিত্রকারদের এই মেরুদণ্ডহীনতার সাক্ষী হয়েও কিন্তু কমিটি লিখলেন :

'সাম্প্রদায়িক, জাতিগত, রাজনৈতিক, এমনকি বর্ণসংক্রান্ত প্রশ্নেও সেন্সার-পর্ষদগুলি যে অতিরিক্ত অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় বোধহয়। ইতিহাস-আশ্রিত কোনো ছবিতে, ধরা যাক ফরাসী বিপ্লবের কিছু দৃশ্য, একজন সাধারণ দর্শককে আইনসম্মত প্রথায় প্রতিষ্ঠিত ভারত সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত করতে পারে, এ অবিশ্বাস্য। শত্রুভাবাপন্ন কোনো শক্তির তৈরি প্রচারধর্মী চলচ্চিত্রের অবশ্য এমন প্রবণতা থাকতেও পারে। কিন্তু একটি ছবির কাহিনীতে সমসাময়িক ঘটনার সামান্যতম প্রতিফলন বা পরোক্ষ সাদৃশ্য থাকলেই ছবিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, এই মনোভাব নিন্দনীয়। সেন্সার-অধিকর্তা বা প্রশাসকদের সেইসব ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনোই উচিত নয়, যাঁরা ব্যক্তিগত অধিকারে বা প্রতিনিধিত্ব-মূলক ক্ষমতার বলে ছবির ঘটনা বা দৃশ্য সম্পর্কে আপত্তি জানান। তুচ্ছাতিতুচ্ছ আপত্তিকে প্রশ্রয় দিলে বিবাদেই উৎসাহ দেওয়া হয়।'

এককথায়, কমিটি এটা যেমন মানতে চাননি যে, সেন্সার-

পর্ষদগুলি নৈতিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে,[৪] তেমনি সমাজসংস্কার বা রাজনীতির ইঙ্গিতবাহী যে-কোনো বক্তব্যেরই কণ্ঠরোধ করার জন্যে সেন্সারের খড়্গ উদ্যত রাখা প্রয়োজন, সেন্সারের এই মনোভাবেরও কোনো যুক্তি তাঁরা খুঁজে পাননি।[৫] বিশদ পর্যালোচনার পর তাঁরা মনে করেছেন, সেন্সারের বিরুদ্ধে সমস্ত আপত্তিই হয় অজ্ঞাতপ্রসূত অথবা গভীর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং বিদ্বেষমূলক ; তবে একথাও তাঁরা বলেছেন যে সমাজ বা রাজনীতি সংক্রান্ত সব ব্যাপারেই সেন্সার-পর্ষদগুলি অতি-উৎসাহী না হয়ে দর্শকদের বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রাখলেই ভালো করবেন। সেন্সার-পর্ষদগুলি যেসব সাধারণ নীতি বা নিষেধবিধির তালিকা অনুসরণ করতেন, সেগুলিকেই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন কমিটি। এমনকি এতদূরও তাঁরা বলেছেন যে, কালের অগ্রগতিতে এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেন্সারব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত আপত্তি আর ভুল ধারণার অবসান হবে।[৬]

এরকম দুদিক বাঁচিয়ে মন্তব্য করার পরেও বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীভূত এক সেন্সারব্যবস্থার সুপারিশ করলেন কমিটি! তাঁদের প্রস্তাব ছিলো, কেন্দ্রীয় সেন্সার-পর্ষদের অফিস থাকবে বোম্বাইতে ; কলকাতায় (এবং দরকার হলে মাদ্রাজে) থাকবেন সহকারী সেন্সার-অধিকর্তা। কেন্দ্রীভূত এই সেন্সারব্যবস্থার নানা খুঁটিনাটি নিয়েই কমিটি আলোচনা করেছেন, যাতে আছে এমনকি আয়-ব্যয়েরও প্রস্তাব।

ভারতের বাজারে আমেরিকান ছবির 'দৌরাত্ম্য' বন্ধ করার ব্যাপারে প্রশাসন ঠিক যেমন সুপারিশ আশা করেছিলেন, তার ধারকাছ দিয়েও কমিটি যাননি। তিনটি মাত্র খণ্ড-মন্তব্যেই কমিটির মনোভাব পরিষ্কার হবে :

১. 'প্রদর্শনক্ষেত্রে আমেরিকান ছবির সংখ্যাধিক্য যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তাহলে অন্যান্য পাশ্চাত্য-

দেশের ছবিও সেই একই বিপদ বহন করবে।'

২. '....কৃত্রিম উপায়ে এক ধরনের অ-ভারতীয় ছবির পৃষ্ঠ-পোষকতা ভারতের পক্ষে কোনো সুফল বয়ে আনবে না। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, প্রদর্শনক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবেই অ-ভারতীয় ছবির সংখ্যা কমানো।'

৩. '....সাম্রাজ্যস্থিত কোনো দেশে তৈরি ছবির ব্যাপারে বা উৎসাহপ্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ কোনো পদক্ষেপের সুপারিশ এখানে করা হচ্ছে না।'

কমিটি বরং উৎসাহ দেখিয়েছেন ভারতীয় ছবির সর্বাত্মক উন্নতির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব প্রণয়নে। যেমন, বাণিজ্য-মন্ত্রকের অধীনে এক চলচ্চিত্র-দপ্তরের প্রবর্তন, কাঁচা ফিল্মের ওপর থেকে সমস্ত রকম আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় চলচ্চিত্র-বিষয়ক অধ্যয়ন এবং শিক্ষালাভের সুযোগ, ছবির গুণগত উৎকর্ষের বিচারে সরকারী পুরস্কারের প্রবর্তন, সিনেমাহলের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে সরকারী উদ্যোগে এবং প্রতিটি সিনেমাহলে বছরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় ছবি দেখানোর আইনগত বাধ্যবাধকতা।

এই শেষের সুপারিশটি অবশ্য কমিটির ইংরেজ সদস্যদের পছন্দ হয় নি। একটি 'মিনিট অব ডিসেন্ট'-এ তাঁরা তাঁদের মতদ্বৈধের কথা ঘোষণাও করেন।

সে যাই হোক্, রঙ্গচারিয়ার কমিটির গুরুত্বপূর্ণ-এই প্রতিবেদনটি সরকারের হাতে পৌঁছনোর পরেও দীর্ঘ এক বছর লালফিতের ফাঁসে বন্দী হয়ে ছিলো। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন পরিষদে প্রস্তাব উঠেছিল কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্যে। কিন্তু প্রশাসনিক আপত্তিতে এবং কূটকৌশলে সে-প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। তারপরে আর কোনোদিন প্রশাসন এই প্রতিবেদনটির কোনো উল্লেখ করেননি—কোথাও।

৮. ‘স্বদেশী’ সিনেমার প্রতিক্রিয়া

ভারতীয় চলচ্চিত্রক্ষেত্রের উন্নতির জন্যে প্রত্যক্ষ সরকারী উদ্যোগের সুপারিশ করে রঙ্গচারিয়ার কমিটি স্পষ্টতই বৃটিশ প্রশাসনের বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন। অবশ্য বৃটিশ-প্রবর্তিত সেন্সারব্যবস্থাকে অপরিহার্য এবং মূলত সন্তোষজনক আখ্যা দেওয়ার ব্যাপারটি প্রশাসনকে কিছুটা স্বস্তিও দিয়েছিল বলে মনে হয়। কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে প্রশাসনের তূষ্ণীভাব এ-দুয়েরই লব্ধফল। ভারতীয় ছবির দুর্দশায় বিচলিত না হয়ে কমিটি যদি ভারতের বাজারে বৃটিশ ছবির জন্যে বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকারের সপক্ষে মত দিতেন অথবা ভারতীয় সেন্সারব্যবস্থার সপ্রশংস মূল্যায়ন না করতেন, তাহলেও বৃটিশ প্রশাসনের এই উদাসীন ভূমিকা দেখা যেতো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।—এসবই অবশ্য নিছক অনুমানের ব্যাপার এবং তা খুব জরুরীও নয়। তথ্যের জন্যে জরুরী বিষয়টি এই যে, বৃটিশ শাসনের অবশিষ্ট সময়ে, অর্থাৎ ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, ভারতীয় সেন্সারপ্রথা মূলেস্থূলে অপরিবর্তিতই ছিলো। ১৯১৮ সালে কার্যকর হওয়া ‘ভারতীয় চলচ্চিত্র আইন’ অথবা ১৯২০ সালে প্রণীত বিধিনিষেধের তালিকা, এগুলির কোনোটিতেই হাত দেননি প্রশাসন।

মনে রাখতে হবে, বৃটিশ শাসনের শেষ কুড়ি বছর কেটেছে রাজনৈতিক অস্থিরতায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে চরম গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব ক্রমাগত প্রসারলাভ করেছে। তারই প্রকাশ হয়েছে অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে, অন্তত চারটি ব্যাপক গণ-আন্দোলনে আর দুটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। এখানে গণ-আন্দোলন বলতে অসহযোগ-আইন অমান্য আন্দোলনের

তিনটি পর্যায় (ফেব্রুয়ারী ১৯৩০-ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, জানুয়ারী ১৯৩২-মে ১৯৩৩ এবং অক্টোবর ১৯৪০-মে ১৯৪১) এবং ভারত-ছাড়ো আন্দোলন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪২), আর সশস্ত্র অভ্যুত্থান বলতে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর আক্রমণ (১৯৪৪) ও বোম্বাইয়ের নৌ সেনা বিদ্রোহকে (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬) বোঝানো হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, বৃটিশ-প্রশাসন 'প্রত্যক্ষ উপদ্রব'-এর মোকাবিলা করেছেন কঠোর হাতেই। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার এবং ব্যাপক গণ বিক্ষোভের পরোক্ষ প্রভাবে মাঝে মাঝেই তাঁদের নমনীয় হতে হয়েছে। ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত 'ভারতশাসন আইন' ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে তাঁরা যদিও হাত দেন নি ১৯৪৫-৪৬ সালের আগে, প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তবনির্ভর পরিবর্তন করেছেন বারবার। সুমিত সরকার যেমন বলেছেন, জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় বৃটিশরাই তাঁদের শাসননীতিতে পরিবর্তন এনেছেন বারবার এবং এক্ষেত্রে বিপরীত প্রক্রিয়ার উদাহরণ বরং অনেক কম। চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও প্রশাসনিক রণকৌশল নির্ভর করতো সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর—ফলে এমনকি সরাসরি সেন্সারপর্ষদগুলির বিবেচ্য বিষয়েও অনেক সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উচ্চতম রাজনৈতিক পর্যায়ে।

১৯২৮-২৯, ১৯২৯-৩০ আর ১৯৩০-৩১—এগুলি ভারতীয় সেন্সার-ব্যবস্থার ইতিহাসে সবচেয়ে নিরুত্তাপ বছরগুলির অন্যতম। এমন নয় যে এই তিন বছরে ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়নি অথবা সেন্সার-কর্তৃপক্ষ (কিংবা প্রাদেশিক সরকার) বিভিন্ন ছবির অংশ-বিশেষ নিয়ে আপত্তি তোলায় সেগুলি বাদ যায়নি। কিন্তু ১৯২০-২১ সাল থেকে ১৯২৭-২৮ সাল পর্যন্ত চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর ওপর যে-হারে সরকারী হস্তক্ষেপ হয়েছে, তার সঙ্গে আলোচ্য তিন বছরের

বিভিন্ন উদাহরণ সংখ্যা বা গুরুত্বের দিক দিয়ে কোনোভাবেই তুলনীয় হবে না। সেন্সারব্যবস্থার সেই প্রথম আট বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অন্তত ২২১টি ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের হস্তক্ষেপে চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী বিঘ্নিত হয়েছে; আর সেন্সারপর্ষদেই নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে ১১৭টি ছবি। এই নিরিখে আমাদের আলোচ্য তিনটি বছরকে ঘটনাবহুল বলা যাবে না কিছুতেই কারণ এই সময়ে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ বা সেন্সারপর্ষদের আপত্তির উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো মাত্র সাতটি।

১৯২৮ সালে সেন্সার-এর ছাড়পত্র পেয়েছিল আমেরিকার ছবি 'পেট্রিয়ট'। কিন্তু প্রশাসনিক আপত্তিতে প্রথমে সংযুক্ত প্রদেশে এবং পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছবিটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয় এবং এটির ছাড়পত্রও বাতিল করা হয়। সফল গণ-অভ্যুত্থানের ফলে অত্যাচারী শাসকের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ঘটনা নিয়ে ছবির কাহিনীবিন্যাস। সরকারী আপত্তিতে বলা হয়েছিল, ছবিটি আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন-এর উদারপন্থী 'চতুর্দশ নীতি'-র একটিকে সমর্থন জানিয়েছে—প্রত্যেক জাতির আপন আপন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণের নিরঙ্কুশ অধিকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে এই নীতি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কাছে এইসব প্রসঙ্গ, বলাই বাহুল্য, অবাঞ্ছিত।

রাজনৈতিক কারণে, অর্থাৎ অবাঞ্ছিত বিষয়ের অজুহাতে, ১৯৩০ সালে বোম্বাইয়ের সেন্সার-পর্ষদ সের্গেই আইনস্টাইন-এর ছবি 'ইভান দ্য টেরিব্‌ল্'-কে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

বিদেশী ছবি সম্পর্কে আর কোনো আপত্তির কথা শোনা যায়নি এই তিন বছরে—এমনকি এসব ছবিতে নৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণাও প্রশাসনকে অস্বস্তিতে ফেলেনি। কিন্তু রবীন্দ্রকাহিনী অবলম্বনে তৈরি ছবি 'বিচারক' (১৯২৯) কলকাতার সেন্সার-পর্ষদে অনুমোদন পায়নি এই নৈতিক কারণেই! সমাজের চাপে এক হিন্দু বিধবার

পতিতাবৃত্তি অবলম্বনের এই কাহিনীর চিত্রায়ণ প্রসঙ্গে কলকাতা-পর্ষদের একজন রক্ষণশীল বাঙালী সদস্যের অভিমত :

'একটা জঘন্য, অস্বাভাবিক ঘটনা, যতই তা বাস্তবনির্ভর এবং সমাজসংস্কারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, ছবির পর্দায় উপস্থাপনের অযোগ্য—কেন না তা আমাদের সূক্ষ্মরুচিকে আঘাত করে।'

পর্ষদের কোনো ইংরেজ সদস্য তাঁর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীটিকে প্রকট করেছেন এইভাবে :

'ছবিটিকে আরো একটি কারণে সমালোচনা করা যায়—সম্রাট-মনোনীত জনৈক বিচারককে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে এক প্রতিকূল এবং ক্ষতিকর দৃষ্টিকোণ থেকে।'

অনেক তদ্বির-তদারকির পর ছবির প্রযোজক ছাড়পত্র জোগাড় করেছিলেন, তা ও ছবিতে আমূল পরিবর্তন করে।

'পেট্রিয়ট' নামের একটি ভারতীয় ছবি ১৯৩০ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো 'দেশপ্রেমের বাণীপ্রচার'-এর অপরাধে। তাতে ছিলো এই ধরনের সাব-টাইট্‌ল্ :

'দেশের স্বাধীনতালাভের জন্যে আমাকে যদি প্রাণ বিসর্জনও দিতে হয়, তাতে আমি রাজি।'

মাদ্রাজ-এর সেন্সারপর্ষদ-অনুমোদিত ভারতীয় ছবি 'র‍্যাথ' (১৯৩১)-এর ওপর সালেম-এর জেলাশাসক স্থানীয় নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন রাজনৈতিক কারণে—ছবিতে নাকি অহিংস-সংগ্রামের তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারও জেলাশাসকের এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়ায় সেন্সার-পর্ষদ বাধ্য হলেন ছবির অনুমোদনপত্র বাতিল (বা প্রত্যাহার) করতে। একই পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ হলো আর একটি ছবি 'ইম্‌মর্টাল গ্লোরী' (১৯৩১)।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত ছিলো তাঁবেদার দেশীয় রাজ্যগুলির স্থায়িত্ব। দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার

সমালোচনা করে ছবি তৈরি হলে তা স্বাভাবিকভাবেই 'রাজনৈতিক কারণে' সেন্সারপর্ষদে নাকচ হয়ে যেতো। এমন একটি ছবি 'দ্য টেরর অব চল্‌তা পুরজা' (১৯২৯)। বোম্বাইয়ের সেন্সার-পর্ষদ ছবিটির বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে লিখেছেন,

'আমাদের মতে, ছবির পুরো কাহিনীটিই দেশীয় রাজন্যবর্গের আচার-আচরণের ব্যঙ্গ-অনুকরণ···দেশীয় রাজা এবং আমাদের সরকারের মধ্যে যে হার্দ্য সম্পর্ক বর্তমান, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ছবিটিকে ছাড়পত্র না দেওয়াই উচিত হবে বলে মনে হয়।'

উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সেন্সার-কর্তৃপক্ষ ছিলেন আগের মতোই তৎপর এবং নির্দয়। এমনকি বিদেশী ছবির মধ্যেও দেশপ্রেমমূলক বা স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ইঙ্গিত বরদাস্ত করতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। শ্বেতাঙ্গ-জাতিদম্ভের বিরোধিতা বা প্রাচ্যের সাপেক্ষে পাশ্চাত্যের বিরূপ সমালোচনার চিত্রায়ণ নিয়ে কোনো সমস্যার উদ্ভব অবশ্য এই তিন বছরের সময়সীমায় হয়নি। এর দুধরনের ব্যাখ্যা সম্ভব—সেন্সার-কর্তৃপক্ষের নমনীয় মনোভাব অথবা তাঁদের অনমনীয় মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে এজাতীয় ছবি তৈরি বা আমদানী বিষয়ে প্রযোজক-পরিবেশকদের সতর্কতা। বিকল্প না হয়ে কার্যকারণ দুটির পরস্পর পরিপূরক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আমরা বলেছি, নৈতিকতার প্রশ্নে বিদেশী ছবি অনুমোদন না-পাওয়ার ছাড়পত্র বাতিল হয়ে যাওয়ার কোনো উদাহরণ এই তিন বছরে নেই। ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রেও 'বিচারক'-এর উদাহরণটিকে একটি ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে। ১৯২০-২১ সাল থেকে ১৯২৭-২৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্নে সেন্সার-কর্তৃপক্ষের সহনশীলতা বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা তৈরি হয়েছিল প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শক মহলে। তাঁদের সেই ধারণা পরিবর্তনের কোনো সুযোগই আর আসেনি—শুধু ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত নয়,

১৯৪৭ সাল পর্যন্তই। কেননা সেন্সার-কর্তৃপক্ষের তরফে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্যের আগ্রহ প্রকাশ পায়নি। আবেগের যে-কোনোরকম 'অতিরেক' প্রকাশের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন নির্মম, নির্দয়। তাছাড়া সময় গড়ানোর সাথে সাথে নিজেদের ক্ষমতা বিষয়ে তাঁদের আস্থাও বেড়েছে—ছবিকে সরাসরি নিষিদ্ধ না করে, প্রযোজক-পরিবেশকদের তাঁরা বাধ্য করেছেন আপত্তিকর অংশগুলির সংশোধনে। প্রযোজক-পরিবেশকরাও সচরাচর সেন্সার-পর্ষদের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। এই 'সমঝোতা'-র পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ শাসনের শেষ কুড়ি বছরে বরং সেন্সারপ্রথার রাজনৈতিক ভূমিকাটিই 'উজ্জ্বল' হয়ে দেখা দিয়েছে। নানা কারণেই ছবিতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আবিষ্কারের ব্যাপারে এসময়ে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। সে-ঐতিহ্যের সূত্রপাত ১৯৩০-৩১ সালে।

রাজনৈতিক বিচারে ১৯৩০-৩১ সালের গুরুত্ব ভারতের ইতিহাসে অপরিসীম। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এক সাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতায় নিমজ্জিত হয়েছিল ভারত। কিন্তু মহাযুদ্ধোত্তর অর্থনীতির তেজীভাব সেই অস্থিরতার প্রশমনে সাহায্য করেছিল। অর্থনীতির সেই 'সমৃদ্ধি' অন্তর্হিত হলো ১৯২৯ সালে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী মন্দা-র কবলে পড়ে। ভারতের ক্ষেত্রে সেই মন্দা-র প্রভাব ছিলো দ্বিমুখী: পণ্যদ্রব্য, বিশেষত কৃষিজ পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যহ্রাস এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য রপ্তানীতে বিপর্যয়। ক্ষতির প্রাথমিক ধাক্কায় বিপর্যস্ত হলেন অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী বা মধ্যচাষীদের দল, যাঁদের হাতে উদ্বৃত্ত পণ্য ছিলো। কৃষিপণ্যের রপ্তানী-ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে এলো পরবর্তী আঘাত। ১৯২৯-৩০ সালে যেখানে ভারতীয় রপ্তানীর মূল্য ছিলো ৩১১ কোটি টাকা, ১৯৩২-৩৩ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ালো ১৩২ কোটি টাকায়—ওই একই সময়ে আমদানীর মূল্য হ্রাস হলো ২৪১ কোটি টাকা থেকে

১৩৩ কোটি টাকা পর্যন্ত। কৃষি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই মন্দা ভারতীয় অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ ফেললো।

রাজনৈতিক নেতারা জনসাধারণকে খুব সহজেই একথা বোঝাতে পারলেন যে, এই অর্থনৈতিক দুর্দশা আমাদের পরাধীনতারই ফল। সেই সঙ্গে মণ্টফোর্ড সংস্কার আইনের অন্তর্নিহিত প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথাও দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো। ১৯২৭ সালে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ-এর যৌথ উদ্যোগে ঘোষিত হয়েছিল 'স্বায়ত্তশাসনের অধিকারদানের দাবী'। ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ঘোষণা করলো 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর দাবী—ততদিনে অবশ্য মুসলীম লীগ-এর সমর্থন হারিয়েছে কংগ্রেস। ১৯৩০ সালের ৩০ জানুয়ারী গান্ধী এগারোটি দাবী সম্বলিত এক 'চরমপত্র' পাঠালেন তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড আরউইন-কে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশাসন এই 'চরমপত্র' উপেক্ষা করলেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে শুরু হলো আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়। আন্দোলনের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, সরাসরি রাষ্ট্রশক্তির উৎখাত বা ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন চালিত হয়নি। বৃটিশ শাসনের কিছু অযৌক্তিক প্রথা, অন্যায় নীতি, আর দমনমূলক আইনের বিরোধিতাই ছিলো আন্দোলনের আশু লক্ষ্য। ফলে প্রথমদিকে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিলো ভারতীয় বুর্জোয়া এবং মধ্যশ্রেণীরই গণ্ডীতে। পরে অবশ্য দেশবাসীর এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, কিছুটা আবেগের বশে আর কিছুটা স্বাধীনতার জন্যে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার আংশিক বাস্তবায়নও হবে এই আশায়, আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। দেশবাসীর আবেগ কতখানি তীব্র ছিলো, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে জেলে বন্দী কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা থেকে। বাংলায় ১৫,০০০ জন, বিহারে ১৪,২৫১ জন, সংযুক্ত প্রদেশে ১২,৬৫১ জন, পাঞ্জাবে ১১,০০০ জন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৫,০০০ জন, বোম্বাই শহরে ৪,৭০০ জন,

দিল্লীতে ৪,৫০০ জন, গুজরাতে ৩,৫৪৯ জন, মাদ্রাজে ২,৯৯১ জন, অন্ধ্রে ২,৮৭৮ জন এবং মধ্যপ্রদেশে ২,২৫৫ জন অর্থাৎ মোট ৯২,১২৪ জন। জওহরলাল নেহরুর দেওয়া ১৯৩১ সালের এই হিসেব[১] থেকে অবশ্য আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বৃটিশ প্রতিক্রিয়ার একটা ধারণাও আমরা পাই। দমন-পীড়নের 'সহজ' পন্থটিই বেছে নিয়েছিলেন প্রশাসন।

পীড়ননীতির অন্যতম প্রকাশ হলো মতপ্রকাশের ওপর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে। ১৯৩০ সালে 'ভারতীয় সংবাদপত্র (জরুরী ক্ষমতা) আইন' প্রণয়ন করে ছাপার অক্ষরে আন্দোলন-বিষয়ে প্রচার, সমীক্ষা বা মন্তব্যের পথরোধ করার চেষ্টা হলো। একই সঙ্গে সেন্সারব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলকেই তাঁদের রাজনৈতিক দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন করে স্পষ্ট সরকারী নির্দেশ জারী হলো। এর ফলে সবচেয়ে আগে বন্ধ হয়ে গেলো বিধিনিষেধ-সংক্রান্ত সাধারণ নীতিগুলির যুক্তিগ্রাহ্য প্রয়োগ। ছবির মূল্যায়নে সেন্সার-পর্ষদের বেসরকারী সদস্যদের মতামতের আর-কোনো গুরুত্বই থাকলো না এরপর। ছাড়পত্র পাওয়া নির্ভর করতো কর্তৃপক্ষের খেয়াল আর মর্জির ওপর। নিষেধাজ্ঞা (সম্পূর্ণ বা আংশিক) জারীর ক্ষেত্রে কারণ দর্শানোর সাধারণ ভদ্রতাসূচক যে-রীতি চালু ছিলো প্রথম আট বছর, তা-ও বন্ধ হয়ে গেলো।[২] বিশেষ আবেদন ব্যতীত এইসব কারণ প্রকাশ করা হতো না। আইন অমান্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সিনেমার পর্দা থেকে সবরকম জাতীয়তাবাদী প্রসঙ্গ নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত এবং তজ্জনিত প্রস্তুতি যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গেই সম্পূর্ণ করেছিলেন প্রশাসন।

যে-সব ছবি সেই সময়ে সেন্সার-পর্ষদ বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল, সেগুলির দিকে একবার তাকানো যেতে পারে।

১৯৩৪ সালে 'সোনে কি চিড়িয়া' নামের এক হিন্দী ছবি থেকে বাদ দিতে হয়েছিল সংলাপের অংশবিশেষ :

'হ্যাঁ, দেশ এবং জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার এ-এক বিরল সুযোগ। তার জন্যে আমাদের অন্যান্য সমস্ত কাজ আর সুখ-সমৃদ্ধির চিন্তা বিসর্জন দিতে হবে।'

অথবা—

'দেশের স্বার্থে যে কোনোরকম ত্যাগস্বীকারই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। অনুভূতিশূন্য জীবনধারণের চেয়ে এভাবে মৃত্যুবরণ করাও ভালো।'

ওই একই বছরে 'বাল জওয়ান' নামের একটি ছবি থেকে বাদ দিতে হলো শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের আপত্তিকর প্রসঙ্গ :

'মানুষের সমাজ কি আজ শয়তানের হাতের মুঠোয়? মানুষ আজ তার সমগোত্রীয়ের রক্তশোষণ করছে, অথচ তারা একই স্রষ্টার সন্তান। ধনীরা বেঁচে আছে দরিদ্রের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে। দরিদ্রেরা বেঁচে আছে ছাইভস্ম খেয়ে, কুকুরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

'সন্ত তুলসীদাস' ছবিতে তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' জাতিভুক্ত মানুষদের মন্দিরে প্রবেশের প্রসঙ্গটিও রাজনৈতিক তাৎপর্যের আশঙ্কায় পরিত্যক্ত হলো—সেন্সারের নির্দেশে।

১৯৩৫ সালের 'মহাত্মা' ছবিতে চিত্রায়িত হয়েছিল ষোড়শ শতকের সন্ত্ একনাথ-এর জীবনকাহিনী। সন্ত্ একনাথ তথাকথিত নিম্নবর্ণের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেছেন। অথচ কাহিনীবিন্যাসে গান্ধীর তৎকালীন কার্যকলাপের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আবিষ্কার করলেন সেন্সার-কর্তৃপক্ষ। প্রথমে ছবিটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো—এতে শুধু বিতর্কিত রাজনীতিরই উল্লেখ ছিলো না, এতে এক প্রাচীন মহাত্মার জীবন-কাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিল 'অসদুদ্দেশে', এই হলো আপত্তি। তদ্বির-তদারকির পর প্রযোজক-পরিবেশক ছবির জন্যে ছাড়পত্র জোগাড় করলেন। তবে ছবির অনেকখানি অংশই বাদ দিতে হলো

তাঁদের, আর ছবির নামটিও পালটিয়ে রাখতে হলো 'ধর্মাত্মা'।

১৯৩৫ সালেই তৈরি হয়েছিল মুন্সি প্রেমচন্দ্-এর কাহিনী অবলম্বনে ছবি 'মজদুর'। সেন্সার-কর্তৃপক্ষের চোখে এ-ছবি ছিলো 'কারখানা-পরিচালনা এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রাবিষয়ে সত্যের অপলাপ—এর ফলে ভারতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কেরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা'। তাঁদের নির্দেশমতো অংশবিশেষ বাদ দেওয়ার পর নতুন একটি নামে ('শেঠ কি লড়কি') ছবিটি পুনর্বিবেচনার জন্যে সেন্সার-কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠালেন প্রযোজক। কিন্তু এবারেও এলো আপত্তি :

> 'সারা ছবিতেই পুঁজি এবং শ্রমের দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে; বলা হয়েছে কীভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর লোকজন শ্রমিকদেরই তৈরি করা সম্পদ হেলাফেলা করে নষ্ট করছে, অথচ সেই উৎপাদক-শ্রমিকেরা বাস করছে এক অবর্ণনীয় পরিবেশে। এভাবে সরাসরি শ্রমিকদের প্ররোচিত করা হচ্ছে।'

প্রযোজকের দাবীতে কর্তৃপক্ষ তাঁদের নির্দিষ্ট আপত্তিগুলি জানালেন এবং তার ভিত্তিতে ছবির 'পরিশোধন' হলো। আপত্তি-গুলো ছিলো এইরকম :

১. শ্রমিকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সমস্ত দৃশ্য, বিশেষত যেসব দৃশ্যে তারা কারখানার পরিচালকদের আক্রমণ করছে বলে দেখা যায় সেই সবকিছু, পুরোপুরি বাদ দিতে হবে।
২. জনতাকে প্ররোচিত করা হচ্ছে এমন সব দৃশ্য কমাতে হবে।
৩. মালিকপক্ষ যেসব দৃশ্যে শ্রমিক এবং তাদের নেতাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে, সেসব দৃশ্য বাদ দিতে হবে; বাদ দিতে হবে এমনকি গুলিচালনার সমস্ত পরবর্তী উল্লেখ।

৪. মালিকপক্ষ মহিলাশ্রমিকদের বিপথে চালিত করতে চাইছে, এমন সমস্ত দৃশ্য বর্জন করতে হবে।

৫. বর্জন করতে হবে সেইসমস্ত দৃশ্য যেখানে আছে শ্রমিক ধর্মঘটের বর্ণনা, অথবা ভাড়াটে মস্তান দিয়ে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা, ধর্মঘটীদের ধর্না ইত্যাদি।

৬. বাদ যাবে নাচঘরে বা ভাটিখানায় মদ্যপানের দৃশ্যগুলি।

৭. বাদ দিতে হবে মুসলিমদের মদ্যপানের দৃশ্য।

অবশেষে 'দয়া কা দেবী' নামে ছাড়পত্র পেলো ছবিটি।

ষোড়শ শতকের পটভূমিকায় তৈরি ছবি 'বেনারসি ঠগ'-এ (১৯৩৭) দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কৃষকশ্রেণীর ওপর কর-আদায়কারী ফৌজদারদের অন্যায় জুলুম এবং কৃষক-সমাজে তার প্রতিক্রিয়া-সংক্রান্ত সমস্ত উল্লেখই বাদ দিতে হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের ছবি 'ইমান ফারোশ' থেকে বাদ গিয়েছিল জনতাদৃশ্য, যেগুলিতে সংযোজিত হয়েছিল 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি।

এই সময়ে বিদেশী ছবিতেও যেখানেই গণ-বিক্ষোভ বা স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের চিত্রায়ণ হয়েছে, সেখানেই সক্রিয় হয়েছে সেন্সার-এর কাঁচি। ১৯৩৪ সালে 'দ্য অ্যাফেয়ার্স অব ভল্‌তেয়ার' থেকে বাদ গেলো সংলাপ :

'কেন গরীবদের মরতে হবে গর্তে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো? কেন অভিজাতরা আত্মসাৎ করবে জমির শাঁসটুকু? এই অন্যায়-অবিচার আমরা বরদাস্ত করবো কেন? গরীবদের জন্যে চাই খাবার, গরীবদের জন্যে—খাবার…'।

১৯৩৬ সালের আর-একটি আমেরিকান ছবি 'ক্যাপ্টেন অব দ্য গার্ড' থেকে বাদ গেলো এইসব সংলাপ :

'স্বাধীনতা অর্জনের শপথ যারা গ্রহণ করতে পারে না, তাদের মৃত্যু হোক্';

'আমাদের বন্দুক অবিরাম গোলাবর্ষণ করুক, অভিজাতদের

রক্তে ভেসে যাক্ রাজপথ। ফ্রান্স মুক্ত হোক্।'

ইংল্যাণ্ড-এর ছবি 'নাইট উইদাউট আর্মার' (১৯৩৭) প্রসঙ্গে সেন্সার-এর মন্তব্য :

'নির্বিচার বোমবাজীর ঘটনায়, বিস্ফোরণের দৃশ্যটুকুই শুধু থাকতে পারে···কিন্তু রুশ ছাত্রেরা বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতিতে যেসব কথাবার্তা বলে, সেসমস্তই বাদ যাবে। বাদ যাবে এমনকি বোমা তৈরির ব্যাপারে প্রাথমিক শলাপরামর্শেরও সংলাপ।'

আমেরিকার ছবি 'দ্য রোড ব্যাক'-এর (১৯৩৭) ক্ষেত্রে তাঁদের বিদগ্ধ মন্তব্য :

'যথাসম্ভব সংক্ষেপ করতে হবে সেইসব জনতার দৃশ্য, যেখানে উপোসী মানুষেরা আইন তুলে নেয় নিজেদের হাতে, দোকানপাট লুঠ করে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে এবং ফলস্বরূপ পুলিস ও সেনাদলের গুলিবর্ষণের মুখে পড়ে।'

আমেরিকারই ছবি 'ব্ল্যাক ফিউরি'-কে (১৯৩৫) নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি প্রশাসন, যেহেতু তাঁদের মতে ছবিটি,

'শ্রমিক-ধর্মঘটের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চায়, শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় প্রতিরোধে উৎসাহিত করে, এমনকি বিস্ফোরকের সাহায্যে মালিকদের সম্পত্তি নষ্ট করার কথাও বলে।'

এই সময়ে বৃটিশ প্রশাসনকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করেছিল অবশ্য সমসাময়িক জাতীয় রাজনীতির ওপর তোলা বেশ কিছু সংবাদচিত্র (newsreel)। তথ্যচিত্র হিসেবে এগুলি যে খুব উন্নতমানের ছিলো, তা নয়। তবে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাভাবিক কারণেই প্রশাসন এগুলির প্রচারে বাধা দিয়েছিলেন সরাসরি নিষেধাজ্ঞা জারী করে। মূলত দেশীয় প্রযোজকদের তৈরি এইসব ছবির তালিকাটি এইরকম :

১. স্বাধীনতার পথে মহাত্মা গান্ধীর যাত্রা।
২. মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক অভিযান।
৩. মহাত্মা গান্ধীর অভিযান—১২ মার্চ, আমেদাবাদ।
৪. লণ্ডন-এর পথে মহাত্মা গান্ধীর যুগান্তকারী যাত্রা।
৫. লণ্ডন থেকে মহাত্মার প্রত্যাবর্তন।
৬. বোম্বাই স্বাগত জানালো মহাত্মা গান্ধীকে।
৭. গোলটেবিল বৈঠক থেকে মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্তন।
৮. শান্তির তীর্থযাত্রা-শেষে মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্তন।
৯. প্রকাশ্য জনসভায় মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা।
১০. মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য নেতাদের বিষয়ে তথ্যচিত্র।
১১. মাণ্ডভী-তে খাদি প্রদর্শনী এবং জুহুতে শ্রীগান্ধী।
১২. মুক্তি পাওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী।
১৩. শান্তিস্থাপনের পর মহাত্মা গান্ধী।
১৪. মহাত্মা গান্ধীর পুনরাগমন।
১৫. (যতীন্দ্রমোহন) সেনগুপ্তের মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রা।
১৬. (বল্লভভাই) প্যাটেল-এর শোভাযাত্রা।
১৭. যতীন্দ্রমোহন দাসের মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রা।
১৮. করাচীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-এর ৪৫তম অধিবেশন।
১৯. জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং অভিবাদন সমারোহ।
২০. রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা।
২১. পণ্ডিত জওহরলালের বাণী।

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে গান্ধীর নেতৃত্বে গণ-জাগরণের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এবং জাতীয়তাবাদী আশা-অকোঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে কংগ্রেস-এর তৎপরতা বিষয়ে এইসব ছবি প্রশাসনের চক্ষুশূল হবে, বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে গান্ধীর ইংল্যাণ্ড-যাত্রার (ডিসেম্বর ১৯৩১) ওপর বিদেশী কোম্পানীর তৈরি সংবাদচিত্রও প্রশাসনের রোষদৃষ্টি এড়ায়নি, যেমন :

১. লণ্ডন-এ গান্ধী
২. লণ্ডন-এ মহাত্মা গান্ধী
৩. গান্ধীর ল্যাঙ্কাশায়ার ভ্রমণ
৪. মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন-এ আগমন
৫. চার্লি চ্যাপলিন-এর সঙ্গে গান্ধী
৬. রাজার সঙ্গে দেখা করলেন গান্ধী
৭. ইংল্যাণ্ড-এ গান্ধীর কার্যকলাপ
৮. গান্ধী-সংবাদ (সবাক)
৯. বোম্বাইয়ে মহাত্মা গান্ধীর আগমন
১০. রাজা আপ্যায়ন করলেন গান্ধীকে

এইসব উদাহরণ আমাদের ঠেলে দেয় একটি সিদ্ধান্তের দিকে—শঙ্কিত প্রশাসন যতখানি ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে নিজেদের হাতে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সংহত করেছিলেন, তার তুলনায় ভারতীয় ছবিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মতামতের প্রতিফলন ছিলো সামান্যই। ১৯৩০-৩১ সাল থেকে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত যে-সময়সীমা, তার মধ্যে বরং বিদেশী ছবির ওপরেই সেন্সার-এর কাঁচি চলেছে বেশি করে। দেশীয় ছবির মধ্যে ব্যতিক্রমী উদাহরণ হয়ে আছে এক রীল-এর সংবাদচিত্রগুলি। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের এই পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব কাহিনীভিত্তিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের ওপর পড়েছিল, এমন কথা বলা যাবে না। ভারতীয় চলচ্চিত্রকারদের দেশপ্রেম (বা তার অভাব) বিষয়ে কটাক্ষ করা যেতেই পারে। কিন্তু তারও বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

১৯৩১ সালে তৈরি 'আলম আরা' ছবিতে শব্দ-সংযোজনের মধ্যে দিয়ে ভারতে সবাক চলচ্চিত্রযুগের সূচনা। পাশ্চাত্যে অবশ্য ততদিনে ছবিতে শব্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন পরিচালক-প্রযোজকের দল। ভারতীয় প্রযোজক-পরিচালকেরাও পিছিয়ে পড়তে রাজী

ছিলেন না। ১৯৩৯ সালের মধ্যে, অর্থাৎ সবাক চলচ্চিত্রযুগের প্রথম নয় বছরে, তৈরি হয়েছিল মোট ১,৩৪২টি সবাক ছবি। স্বভাবতই টকী-র (talkie) এই প্রথম যুগে চলচ্চিত্রকারেরা ব্যস্ত ছিলেন নতুন মাধ্যমটি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর জ্ঞান-অর্জনের কাজে। বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় তখন কোথায়? প্রথম-দিকের টকী-তে ছিলো নাচগানের প্রায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। এসব অবলম্বন করেও ছবিতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়; কিন্তু তার জন্যে যে-দক্ষতা আর রুচির প্রয়োজন, ভারতীয় চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে ছিলো তার একান্ত অভাব।

বিশ শতকের চতুর্থ দশকের (১৯৩০-৩৯) আর-এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো স্টুডিও-প্রথার সমৃদ্ধি। ছবিতে শব্দ আসার সঙ্গে সঙ্গে ছবি তৈরির খরচ অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। শব্দ-সংযোজনের যান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি ছিলো যেমন জটিল, তেমনি ব্যয়সাধ্য। বিশেষ এক ধরনের শব্দনিরোধী মঞ্চে এসব ছবির শুটিং হতো। এই মঞ্চনির্মাণের জন্যে যে বিপুল অঙ্কের প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিলো, তৃতীয় দশকে (১৯২০-২৯) প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রনির্মাণ-সংস্থাগুলির পক্ষে নতুন করে সেই অতিরিক্ত ব্যয়ভারের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয়নি। মূলত ব্যক্তিগত উৎসাহ ও বিনিয়োগে চালিত এইসব সংস্থা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেলো। যেসব প্রযোজনা-সংস্থা এগুলির জায়গা নিলো, সেগুলি সংগঠিত হয়েছিল আধুনিক জয়েন্ট স্টক কোম্পানী বা লিমিটেড কোম্পানী পরিচালনার মূল-নীতির ভিত্তিতে। এখানে বিনিয়োজিত অর্থ বা মূলধন যে শুধু পরিমাণেই বেশি ছিলো তা নয়, মূলধন-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এখানে অনুসৃত হতো পুঁজিকেন্দ্রিক উৎপাদনরীতির সমস্ত আধুনিক কলা-কৌশল।

এখানে বলা দরকার, উৎপাদনের কাজে যে আর্থিক মূলধন ব্যবহৃত হয়, তা পুঁজি হতেও পারে, না-ও হতে পারে। সাধারণ

ভোগচাহিদা (consumption demand) পূরণের কাজে যে মূলধন ব্যবহৃত হয়, তাকে সঠিক অর্থে পুঁজি বলা যায় না। পুঁজির ধর্ম হলো নিরন্তর মুনাফাঅর্জনের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। মুনাফা আসে উৎপন্নের উদ্বৃত্তমূল্য থেকে। কেবল ভোগচাহিদা পূরণের 'সংকীর্ণতায়' উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টির সম্ভাবনা কম বলে পুঁজিকেন্দ্রিক উৎপাদন তাতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এ-প্রথার বৈশিষ্ট্য ব্যাপক-উৎপাদন (mass production)। এখানে উৎপন্নের ব্যবহারিক মূল্য গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য হয়ে ওঠে সেটির বিনিময়মূল্য —উদ্বৃত্তমূল্য থাকে এই বিনিময়মূল্যেই নিহিত।[৩] মানুষ বা সমাজের কাছে উৎপন্নটির কী তাৎপর্য, সেটি আর গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। সেটি বাজারে কীভাবে, কত দামে বিকোবে সেই প্রশ্নের উত্তরটাই পুঁজি-পতির কাছে জরুরী হয়ে পড়ে: উৎপন্নকে পণ্যে রূপান্তরিত করাই পুঁজিকেন্দ্রিক উৎপাদনরীতির কাজ। পণ্য-উৎপাদনের ফলে বাজার থেকে আহরিত উদ্বৃত্তমূল্যের একটি অংশ আবার রূপান্তরিত হয় পুঁজিতে, যা মূলধনের অতিরিক্ত। এইভাবে পণ্য-পুঁজির উৎপাদন-পুনরুৎপাদন চক্রে আবর্তিত হয় পুঁজিকেন্দ্রিক উৎপাদনরীতি।

চতুর্থ দশকে স্টুডিও-প্রথার এই গুণগত পরিবর্তনের সূত্রে চলচ্চিত্রও এদেশে রূপান্তরিত হলো পণ্যে। তৃতীয় দশকে হতো চলচ্চিত্র-নির্মাণ; চতুর্থ দশকে শুরু হলো চলচ্চিত্র-উৎপাদন। সিনেমার বিনোদনমূল্যকে ছাপিয়ে গেলো সেগুলির বিনিময়মূল্য। এই সময়ে, নিউ থিয়েটার্স, প্রভাত স্টুডিও, রঞ্জিত মুভটোন বা বম্বে টকীজ-এর মতো বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে একই সঙ্গে একাধিক ছবির কাজ চলতো।[৪] স্টুডিওর অভ্যন্তরীণ বিন্যাস ছিলো যে-কোনো কারখানার অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। চলচ্চিত্র-নির্মাণের প্রতিটি পর্যায় সুসম্পন্ন করার ব্যবস্থা থাকতো এইসব স্টুডিওতে।[৫]

এইভাবে সংগঠিত উৎপাদন-সংস্থার কর্ণধারেরা স্বভাবতই চাইবেন, তাঁদের পণ্যের বণ্টন যাতে ব্যাহত না হয়। সেন্সার-এর আপত্তিতে

পড়তে পারে, এমন ছবি তৈরিতে তাঁরা যে উদ্যোগী হবেন না, এটাই স্বাভাবিক।[৬] ফলে স্টুডিওগুলোতে একের পর এক তৈরি হতে লাগলো সাধারণ কিছু সমাজসমস্যা নিয়ে সংস্কারমূলক ছবি—বিন্যাস এবং চিত্রায়ণের দুর্বলতায় এইসব সমস্যা রূপান্তরিত হতো নিছক পারিবারিক সমস্যায়। যেমন, নিউ থিয়েটার্স-এর ছবি 'দেবদাস' (১৯৩৫), 'অধিকার' (১৯৩৭) বা 'মুক্তি' (১৯৩৯); প্রভাত স্টুডিও-র ছবি 'অমর জ্যোতি' (১৯৩৬), 'দুনিয়া না মানে' (১৯৩৭) বা 'আদমী' (১৯৩৯); বম্বে টকীজ-এর ছবি 'সাবিত্রী' (১৯৩৭) বা 'অচ্ছুৎ কন্যা' (১৯৩৬)। সরাসরি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বা আশু পরিবর্তন প্রয়োজন এমন কোনো সমাজসমস্যা নিয়ে কোনো বড়ো স্টুডিও তাৎপর্যপূর্ণ ছবি করছে, এমন নজীর প্রায় নেই। বড়ো স্টুডিওর মালিকেরা সেন্সার-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপস করার সহজ পথটাই বেছে নিয়েছিলেন।[৭] অবশ্য ছোটখাটো স্টুডিওগুলি যে আপাদমস্তক বিতর্কিত বা প্রতিবাদী ছবি তৈরি করেছিল, এমন নয়। তবু সেন্সার-কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করার মতো কিছু কিছু কাজ যে এসব জায়গায় মাঝে-মাঝেই হতো, তার প্রমাণ আমাদের দেওয়া উদাহরণগুলি।

এই সময়ের এমন কিছু উদাহরণও আছে, যা বৃটিশ-তোষণেরই সামিল। মাদ্রাজের স্টুডিও ন্যাশনাল থিয়েটার্স 'চরকাসুন্দরী' নামে একটি তামিল ছবির প্রস্তুতি শুরু করেছিল ১৯৩২ সালে। ছবিতে একজন মেয়ের কথা বলা হয়েছিল, যে তার পঙ্গু, অথর্ব বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং একই সঙ্গে পরিবারের ভরণপোষণ করতো চরকায়-কাটা সুতো বেচে। কোম্পানী এই কাহিনীর সারাংশ সেন্সার-কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে জানতে চান, এ-ছবির ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হবে কি না। সেন্সার-অফিস থেকে কোম্পানীতে জানানো হয় যে বিষয়টি আপত্তিকর এবং *সাধারণ্যে প্রদর্শনের অযোগ্য।* সেন্সার-এর চাপের কাছে নতি-স্বীকার করে কোম্পানী তাঁদের পরিকল্পনাটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা

করেন। এভাবেই ছবি তৈরি শেষ-হওয়ার মুখে পরিত্যক্ত হয়েছিল আর একটি তামিল ছবি 'মিস সুগুণা' (১৯৩৭)।[৮]

চতুর্থ দশকের শেষের দিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু অন্যরকম হয়ে যায়। ১৯৩০ সালের মে মাসে কংগ্রেস-এর তরফে আইন অমান্য কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষিত হয়। ঐতিহাসিকদের সন্দেহ, কেবল বৃটিশ-দমননীতিই এর একমাত্র কারণ নয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বও ঘটনাটিকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাঁদের আরো অনুমান, কংগ্রেস-এর পৃষ্ঠপোষক ব্যবসায়ী-শিল্পমালিক গোষ্ঠীর চাপও এর জন্যে কিছুটা দায়ী। দলের মধ্যেকার নরমপন্থী গোষ্ঠী এরপর দলকে নিয়ে গেলেন শাসনব্যবস্থায় সীমিত অংশগ্রহণের পথে। কেননা, ১৯৩৫ সালের 'ভারতশাসন আইন' নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, জেলা-ভিত্তিক এবং আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সূত্রে শাসন কাঠামোর সীমিত ভারতীয়করণের সুযোগ করে দিয়েছিল। নরমপন্থী গোষ্ঠীর যুক্তি ছিলো এই যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আইনপ্রণয়ন পরিষদে গিয়ে ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী আইন-প্রণয়নে প্রশাসনকে বাধা দিতে পারবেন আরো ভালোভাবে।

১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন—এই নির্বাচনে অবশ্য নির্বিশেষ বয়স্ক ভোটাধিকার-এর সূত্র (universal adult franchise) মানা হয়নি ; প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ১২ শতাংশ এই নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার পেয়েছিলেন। এগারোটির মধ্যে আটটি প্রদেশের আইন-পরিষদে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো এবং অনেক দ্বিধার পর এইসব প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হলো। আরো দুটি প্রদেশে কংগ্রেস মুসলীম লীগ-এর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিলো। 'ভারতশাসন আইন'-এ অবশ্য নির্বাচিত মন্ত্রী-*সভার হাতে খুব বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়নি—রাজনৈতিক বা*

অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো বৃটিশ রাজকর্মচারীদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণেই ছিলো। তাহলেও ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে বৃটিশ-দমননীতি কিছুটা সংযত ছিলো। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এক অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল দেশ জুড়ে। পরিপূরক হিসেবে একই সঙ্গে পুষ্ট হচ্ছিল সামন্তবাদ আর পুঁজিবাদ-বিরোধী মানসিকতাও। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই এই মানসিকতায় জারিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের উদ্যোগে সিনেমার পর্দাতেও এ-ধরনের কিছু প্রসঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছিল এই সময়।

সমাজসংস্কারমূলক ছবির তো জোয়ার এসেছিল এই আড়াই বছরে। ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করা দরকার, এমন ইঙ্গিতও থাকতো এইসব ছবিতে। সেন্সার-এর বিধিনিষেধ-সংক্রান্ত নীতিগুলি, প্রাদেশিক সরকারের উপদেশে, অনেক নমনীয়তার সঙ্গে প্রযুক্ত হতো তখন। এমনকি সেন্সার-পর্ষদগুলির সংগঠন পরিবর্তিত হয়েছিল এই কংগ্রেস-আমলে।[১] এবিষয়ে এস. থিয়োডর ভাস্করন লিখেছেন :

> 'সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয় এবং চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিরা সেন্সার-পর্ষদের সদস্যপদ পাওয়ায় সেগুলির আমলাতান্ত্রিক চরিত্রে কিছুটা পরিবর্তন এলো। রাজনৈতিক উল্লেখের ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতার প্রবর্তন করে যৌনতা বা হিংসা-সংক্রান্ত নৈতিক বিষয়গুলিতেই পর্ষদকে আবদ্ধ থাকতে বলা হলো। সেন্সারের কাঁচি এড়াতে যেসব চলচ্চিত্রকার এতদিন পরোক্ষ সব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তাঁরা এই নবলব্ধ স্বাধীনতা সদ্ব্যবহারে উঠেপড়ে লাগলেন। কংগ্রেস-রাজত্বের এই আড়াই বছরে স্বদেশী সিনেমার যেন একটা জোয়ার এলো...।'

শ্রী ভাস্করন-এর মন্তব্যটি মূলত তামিল সিনেমার পরিপ্রেক্ষিতে

করা। তামিল চলচ্চিত্রক্ষেত্রে এই আড়াই বছরে বয়ে-যাওয়া 'নতুন হাওয়া'-র প্রসঙ্গে তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন তিনি :

'অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পোক্ত বাণিজ্যভিত্তি এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল একদল পরিচালক-শিল্পী।'

তামিল সিনেমায় এইসময় প্রচলিত মানসিকতার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে দুটি মন্তব্যে। তামিল দৈনিক 'দিনমণি'-তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের অংশ :

'দেশের কাজে এখন প্রয়োজন প্রচারধর্মী সিনেমা। স্বাধীনতার যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা নিতে পারে এই ধরনের সিনেমা। একমাত্র সিনেমার পক্ষেই একসঙ্গে অনেক জায়গায় বিক্ষোভ সংগঠিত করা সম্ভব—এবং প্রথম সারির শিল্পী-লেখকেরাই একাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।'

ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ম্যাড্রাস মেল'-এর প্রতিবেদন :

'সম্প্রতি ভারতীয় ছবিতে এসেছে এক নতুন হাওয়া। প্রযোজকেরা দেশে জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে ক্রমশই সচেতন হচ্ছেন। জাতীয় আন্দোলনের সপক্ষে প্রচার চালানোর মাধ্যম হিসেবে সিনেমাকে ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে। চলচ্চিত্র-পিপাসুদের উচিত এজাতীয় ছবিকে স্বাগত জানানো।'

সেই সময়কার রাজনৈতিক প্রচারধর্মী তামিল ছবির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো 'বলীবর সঙ্গম' (১৯৩৮), 'আনন্দাশ্রমম্' (১৯৩৯), 'দেশভক্তি' (১৯৩৯) এবং 'ত্যাগভূমি' (১৯৩৯)। রাজনৈতিক প্রচারের বাহন হিসেবে তামিল সিনেমা তখন যে খ্যাতি এবং মর্যাদা অর্জন করেছিল, সমসাময়িক হিন্দী বা বাংলা সিনেমা ঠিক সেই পর্যায়ে বিখ্যাত হয়নি। তবু সংস্কারমূলক ছবি তৈরিতে বোম্বাই বা কলকাতা একেবারে পিছিয়ে থাকেনি। পরবর্তীকালে খাজা

আহম্মদ আব্বাস স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে :

'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার এই পরিস্থিতিতে, গণতন্ত্র এবং জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকারের প্রসঙ্গগুলি এমনকি পুরাণ-আশ্রিত ছবিতেও ব্যবহৃত হতে থাকলো—যেমন 'গোপালকৃষ্ণ' (১৯৩৮) ছবিতে স্বৈরাচারী রাজা কংসের বিরুদ্ধে সাধারণ গোপালক কৃষ্ণের যে সংগ্রাম, তা দর্শকদের মনে দেশপ্রেমের ভাব না-জাগিয়ে থাকতে পারেনি।'[১০]

শ্রীভাস্করন-এর আর একটি মন্তব্যও কৌতূহলোদ্দীপক :

'প্রথমে জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন প্রতীক, যেমন চরকা বা গান্ধীর প্রসঙ্গগুলি, ছবির নানা দৃশ্যে সূক্ষ্মভাবে সংযোজিত হতো। এমনকি চমকদার ছবিতেও (stunt films) অন্তত একটা করে দেশপ্রেমমূলক গান বা ঘটনা কাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো।'

এভাবে নিছক বিনোদনমাধ্যম হিসেবে সিনেমার যে-অপবাদ ছিলো সাধারণ্যে, তা ঘুচলো এই সময়ে। সংস্কৃতির অন্দরমহলে পাশের ছাড়পত্র না পেলেও ভারতীয় সিনেমা এদেশের সামাজিক জীবনে মূল স্রোতের সঙ্গে মোটামুটি একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। বিশেষ করে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে দেশীয় ছবির বিষয়ে যে একটা অবজ্ঞতার ভাব ছিলো প্রথম থেকেই, তা-ও অনেকখানি কমে গেলো এই চতুর্থ দশকে। ততদিনে উৎপাদন-উদ্যোগ (industry) হিসেবে তার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৩৯ সালের এক পরিসংখ্যানে চলচ্চিত্র-উদ্যোগের স্থান ছিলো বিভিন্ন উৎপাদন-উদ্যোগের সারণীতে অষ্টম—এটা গুরুত্বের নিরিখে। সংগঠিত উদ্যোগের সবরকম বৈশিষ্ট্যই তা অর্জন করেছে তখন—১৯৩২ সালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশ-প্রদর্শক সংস্থা গঠিত হয়েছে, 'মোশান পিকচার সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া' নামে; পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে সংগঠিত হয়েছে এই সংস্থার আঞ্চলিক শাখা,

যেমন কলকতায় 'বেঙ্গল মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন' (১৯৩৬), বোম্বাইতে 'ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন' (১৯৩৭), মাদ্রাজে 'সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স' (১৯৩৮)। ১৯৩৯ সালের মে মাসে বোম্বাইতে আয়োজিত হলো 'ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার কংগ্রেস'।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই নতুন ভূমিকা এবং দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তার এই নবলব্ধ মর্যাদা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ওপরেও প্রভাব ফেলেছিল।

এদেশে সেন্সারপ্রথা প্রবর্তনের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে কর্তৃপক্ষ এমন কিছু ছবির ক্ষেত্রে ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যেগুলিতে তাঁদের মতে 'পাশ্চাত্য-সভ্যতা বা শ্বেতাঙ্গ জীবনাদর্শকে বিকৃত করে তুলে ধরে প্রাচ্যবাসীদের চোখে সেটিকে হেয় করা হয়েছিল'। এসব ছবির অধিকাংশই যে বিদেশী, তা-ও আমরা দেখেছি। বৃটিশ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এসব ছবি 'শ্বেতাঙ্গ জাতির স্বাভাবিক গরিমা' নামক সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বটির ঠিক অনুকূল ছিলো না। এমন সব বিদেশী ছবিকে ছাড়পত্র দেওয়া হতো, যেগুলিতে প্রাচ্যদেশীয় চরিত্রগুলি তুলনামূলকভাবে হীন বা অন্যায়কর্মে লিপ্ত। এভাবে পরোক্ষে প্রাচ্যসভ্যতাকেই অপমান করা হতো। চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে জাতীয়তাবাদী গণচেতনা প্রসারের ফলে এইসব ছবির বিষয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম হলো দর্শকসমাজে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মর্যাদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিক্রিয়া আরো সংগঠিত সুষ্ঠু রূপ পেলো। শিক্ষিত সমাজ এবং জাতীয়তাবাদী নেতারা বিদেশী ছবিতে ভারতীয় ঘটনাবলী এবং চরিত্রের অবমাননাকর রূপায়ণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলেন।

১৯৩৫ সালে 'দ্য লাইভ্‌স্‌ অব দ্য বেঙ্গল ল্যান্সার্‌স্‌' এবং 'ক্লাইভ অব ইণ্ডিয়া' নামের দুটি ছবি নিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রচুর

লেখালেখি হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ছবি দুটির বিষয়ে প্রশ্নও উঠেছিল। ছবিগুলি দেখে স্বরাষ্ট্র সচিব স্বীকারও করেছিলেন যে এগুলির বিষয়ে যেসব আপত্তি জানানো হয়েছে, সেসবই ন্যায্য আপত্তি। ভবিষ্যতে এ-জাতীয় ছবি যাতে ভারতে ছাড়পত্র না পায়, সে-আশ্বাস তিনি পরিষদ-সদস্যদের দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে বৃটিশ প্রশাসন সরাসরি হলিউড-এ প্রযোজক-পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুরোধ করেন যেন ভারত-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ছবি করার সময় বিষয় এবং চরিত্র নির্বাচন-রূপায়ণে তাঁরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। তাঁদের বক্তব্য :

> 'এসব ছবিতে বৃটিশ নীতির সমালোচনা করা হলেও সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে না। কিন্তু এগুলিতে ভারতীয় চরিত্রাবলীকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়, তাতে এদেশের দর্শক আহত হতে পারেন। দুঃখের বিষয়, ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় যেসব ছবি তৈরি হয়, প্রায়ই সেগুলিতে ভারতীয়দের দেখানো হয় অবদমিত জাতি হিসেবে—তারা বিদ্রোহ করতে চায়, অথচ বৃটিশরা বারবার তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের হতাশ করে দেয়।'[১১]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের 'অনুগত জাতি' হিসেবে দেখালে বিশেষ আপত্তি নেই। কিন্তু আত্মমর্যাদাসচেতন ভারতীয় চরিত্রের উপস্থাপনা বা বৃটিশ-শাসনের বিরোধী হিসেবে ভারতীয়দের উল্লেখ বৃটিশ প্রশাসনের না-পসন্দ্। তবে আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ছবির পর্দায় ভারতীয়দের নিয়ে সরাসরি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাঁরা সায় দিতে পারেননি কূটনৈতিক কারণে। সেই সময়ে ভারতে খুব বড়ো আকারে রাজনৈতিক অসন্তোষ ধূমায়িত হলে, তার মোকাবিলা করতে গিয়ে বৃটেন-এর যুদ্ধপ্রস্তুতি ব্যাহত হতো। ফলে বৃটেন-এর স্টুডিওতে ভারতীয়দের হেয় করা হয়, এমন ছবি তৈরি করব ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হতো। আমেরিকান সরকারও

যাতে হলিউড-এ এধরনের ছবি তৈরিতে বাধা দেন, তার জন্যে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত থাকতো। এসব সত্ত্বেও এমন কিছু ছবি ভারতে চলে আসতো যেগুলিতে ভারতীয়দের চিত্রায়ণ নিয়ে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হতো এবং সমালোচনার গুরুত্ব বুঝে অনেক সময়েই প্রশাসন ছবিগুলির প্রদর্শনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হতেন। এব্যাপারে বিখ্যাত (বা কুখ্যাত) হয়ে আছে এসব ছবি : 'দ্য ড্রাম', 'দ্য সীজ অব লাখ্‌নউ', 'দ্য ব্ল্যাক হোল অব ক্যালকাটা', 'দ্য টাইগার অব কৃষ্ণাপুর', 'গঙ্গাদীন'।

ভারতীয় চলচ্চিত্রক্ষেত্রের এই সংগঠিত রূপ এবং তার পেছনে শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থন, পরবর্তীকালে মাধ্যমটির উন্নয়নে যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে ভাবা গিয়েছিল, তা ব্যাহত হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধজনিত রাজনৈতিক অস্থিরতায়।

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেট বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। একই দিনে ভাইসরয় লিন্‌লিথ্‌গো-ও এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারতকে এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত করলেন।—১৯৩৭ সাল থেকেই যুদ্ধের মেঘ ঘনাচ্ছিল ইওরোপ-এর আকাশে। হিটলার-এর আগ্রাসী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে বৃটেন এবং আমেরিকা তাদের সাধারণ শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর সাম্যবাদী সরকারের পতন ঘটাতে চাইলো। কিন্তু হিটলার-এর প্রথম আঘাত এলো পশ্চিম দিকেই। তার ঝটিকাবাহিনীর তাণ্ডব ক্ষতবিক্ষত করলো ইওরোপ-কে। বাধ্য হয়েই হিটলার-এর সশস্ত্র মোকাবিলায় নামলো বৃটেন। বৃটেন যদিও প্রচার করেছিলো যে এ-যুদ্ধ গণতন্ত্রের যুদ্ধ, আদতে এ-যুদ্ধ ছিলো দুই সাম্রাজ্যবাদী জোটের মধ্যে বাজার-দখলের লড়াই।

কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রথম থেকেই বৃটেন-জার্মানী দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন—অন্তত প্রকাশ্যে। যুদ্ধপ্রয়াসে ভারতকে জড়িত করে বৃটিশ-প্রশাসনের একতরফা সিদ্ধান্ত তাঁদের বিক্ষুব্ধ করে

তুললো : 'তথাকথিত এই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতারক্ষার যুদ্ধে ভারতবাসী নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে না, কারণ সেই স্বাধীনতায় তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।' সেপ্টেম্বর-এর শেষে আটটি প্রদেশে আড়াই বছরের কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করলো। শুরু হলো কংগ্রেস-বৃটিশ 'ঠাণ্ডা লড়াই', যার পরিণতি ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কঠোরতর হলো। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সিনেমার পর্দায় জাতীয়তাবাদী চেতনার যে-প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল, সেকথা মনে রেখেই এই কড়াকড়ি। এমনকি কংগ্রেস-শাসনের সময়ে ছাড়পত্র-পাওয়া জাতীয়তাবাদী চেতনাসমৃদ্ধ বেশ কিছু ছবিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। সেন্সার-কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের চাপে ছবিতে জাতীয়তাবাদী চিহ্ন আর প্রতীক ব্যবহারের প্রথাও বন্ধ হয়ে গেলো। 'ভারতরক্ষা আইন'-এর মতো প্রশাসনিক হাতিয়ারও সংযোজিত হলো চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচার-সংক্রান্ত বিশেষ কিছু বিধি। সেন্সার-পর্ষদের চেয়েও উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন 'যুদ্ধসংক্রান্ত প্রচার আধিকারিক' (Directorate of War Publicity) গঠিত হলো। এর কাজ ছিলো, সিনেমায় যুদ্ধবিরোধী প্রচার রোধ করা। ভারতের বাইরে 'জাতীয়তাবাদী' ছবি যাতে না পৌঁছতে পারে, তা দেখার জন্যেও নিযুক্ত হলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। ১৯৪০ সালে আরো সংগঠিত হলো 'চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পর্ষদ' (Film Advisory Board), যুদ্ধপ্রস্তুতির সমর্থনে ভারতীয় ছবি তৈরিতে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। কাঁচা ফিল্মের জোগানের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হলো, কাহিনীর তাৎপর্য বিচার করে কাঁচা ফিল্ম বণ্টন করতেন সরকার। পর্ষদেরই সুপারিশে প্রশাসন 'ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারাড' নামের সংবাদ-চিত্রমালা প্রবর্তন করেছিলেন ১৯৪৩ সালে। প্রত্যেকটি সিনেমাহলে এইসব ছবি দেখানো

বাধ্যতামূলক হলো।

এসবের অর্থ, ১৯৩০-৩১ সালের মতোই নিপুণভাবে চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যাপক ক্ষমতা নিজেদের হাতে সংহত করেছিলেন প্রশাসন। এই প্রশাসনিক উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়েছিল। ভারতীয় চলচ্চিত্র আবার ফিরে গেলো ১৯৩১-৩৭ সালের মেরুদণ্ডহীনতায়। এমনকি 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-ও এই মেরুদণ্ডহীনতায় আঘাত হানতে পারেনি। বৃটিশ শাসনের শেষ সাত-আট বছরে কয়েকটি ভারতীয় এবং বিদেশী ছবির ওপর সেন্সার-এর কাঁচি চলেছিল, এটা ঠিক; কিছু ছবি স্থানীয় ভিত্তিতে নিষিদ্ধও হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে ভারতব্যাপী নিষেধাজ্ঞার নজীর পাওয়া যায় মাত্র দুটি। এদের নাম 'হামারা দেশ' (১৯৩৯) এবং 'রায়তু বিড্ডা' (তেলেগু, ১৯৪০)। প্রথম ছবিতে কৃষকদের খাজনা-বিরোধী আন্দোলন এবং রাজনৈতিক ডাকাতির চিত্রায়ণ ছিলো। দ্বিতীয় ছবিতে সামন্ত-প্রথার সমালোচনা ছিলো।

'সংশোধিত' ছবির তালিকাটি অবশ্য আর একটু দীর্ঘ। 'চাঁদনী' (১৯৪১) নামের হিন্দী ছবিটিতে শেষ দৃশ্যের সংলাপে ছিলো গান্ধী-নেহরু প্রসঙ্গ। সেন্সার-এর আপত্তিতে তা বাদ গেলো। 'প্রেম সঙ্গীত' (১৯৪৩) এবং 'বদলতি দুনিয়া' (১৯৪৩) নামের দুটি হিন্দী ছবি থেকে দুটি গান বাদ দিতে হয়েছিল সেন্সার-এর নির্দেশ, কারণ সেগুলিতে বিদেশী শাসক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল। একই ধরনের আরো কিছু উদাহরণ :

১. মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত উল্লেখ বর্জন করতে হবে।
২. মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির সামনে রাজা কংগ্রেসী-প্রথায় অভিবাদন জানাচ্ছেন, এসব দেখানো চলবে না।
৩. রাজার বক্তৃতায় যেখানে তিনি ইংরেজির বিরোধিতা করছেন এবং হিন্দী ভাষার সপক্ষে বলছেন, সেটা বাদ যাবে। [তিনটিই 'রাজা' ছবি (১৯৪৩) থেকে]

৪. শেষের তিনটি গানে যেখানে শৃঙ্খলিত ভারতের কথা বলা আছে এবং দৃশ্যত তা উপস্থাপিত হচ্ছে, সেসব বাদ দিতে হবে। বাদ দিতে হবে এইসব শব্দও: 'ভুখে মরে বাঙ্গাল', 'বন্দে মাতরম', 'ইনকিলার জিন্দাবাদ' এবং 'অখণ্ড হিন্দুস্তান'।

['গজভাউ' ছবি (১৯৪৪) থেকে]

৫. যে-দৃশ্যে স্কুলের ছেলেমেয়ে এবং রাস্তার ভিখারি ছেলে-মেয়েদের দেখে আমেরিকান সৈন্যরা গাড়ী থামিয়ে তাদের সঙ্গে 'জয় হিন্দ' চিৎকারে গলা মেলায়, সেটা বাদ যাবে। ['অভিযাত্রী' ছবি (১৯৪৬) থেকে]

১৯৪২ সালের ছবি 'ধীরাজ' সমগ্র সংযুক্তপ্রদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। এ-ছবির বিরুদ্ধে ছিলো কংগ্রেসী বাণী-প্রচারের অভিযোগ—স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এক মিছিলের দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল তারা ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা হাতে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে চাঁদা তুলছে।

এই সময়ে রাজনৈতিক কারণে বিদেশী ছবি নিষিদ্ধকরণের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছে 'হ্যাংমেন অল্‌সো ডাই' নামের ছবিটি (আমেরিকা, ১৯৪৩)। বেরটোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌-এর কাহিনী অবলম্বনে ফ্রিজ লাং পরিচালিত এ-ছবির অপরাধ: 'এর সমগ্র বিষয়বস্তুতে ছিলো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সমর্থন।' 'হাওয়ার্ড্‌স্‌ অব ভার্জিনিয়া' (১৯৪২) নামের ছবিতে চিত্রায়িত হয়েছিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কাহিনী। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সাম্য-স্বাধীনতা ঘিরে কথাবার্তা থাকায় ছবির প্রশাসনের মনঃপুত হয়নি। সেন্সার-পর্ষদকে না-জানিয়েই তাঁরা ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন।

বৃটিশ-প্রশাসনের এই অতি-সংবেদনশীলতা (বা স্পর্শকাতরতা) অবশ্য নিতান্ত নিরীহ চলচ্চিত্রকারের রচনাতেও জাতীয়তাবাদী প্রচারের ইঙ্গিত আবিষ্কার করতো। সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে সরকারী আনুকূল্যে তৈরি ওয়াড়িয়া মুভিটোন-এর 'স্টাণ্ট ফিল্ম'-এ

নায়ক-নায়িকার ‘নির্ভীক’ কার্যকলাপ প্রশাসনের চোখে ‘সমাজ বিপ্লব’-এর ইঙ্গিতবাহী হিসেবে ধরা দিলো। ফলে কয়েকটি মাত্র ছবির পর এ-ধরনের ছবি তৈরি বন্ধ করে দেওয়া হলো। শুধু তা-ই নয়—পুরনো ছবিগুলোকেও প্রদর্শনক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করা হলো। সোরাব মোদী-র ‘ঐতিহাসিক’ ছবি ‘সিকান্দার’-ও প্রশাসনের চোখে হয়ে দাঁড়ালো বিপজ্জনক। সৈন্যদের ছাউনিতে এ-ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ হলো। সরকারী অর্থানুকূল্যে তৈরি আর একটি ছবি ‘মানসরাক্ষসম্’-এর জাপ-বিরোধী কাহিনীতে প্রশাসন খুঁজে বার করলেন ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’-এর ছায়া। এ-ছবির ওপরেও নেমে এলো নিষেধাজ্ঞার অভিশাপ।

১৯৪৫-৪৬ সালেই অবশ্য চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেছে ভাটার টান। ততদিনে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার রূপ নিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পর্যুদস্ত বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ তখন পঙ্গুপ্রায় অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। ১৯৪৬ সালের ২৪ আগস্ট ভারতীয় সংখ্যাধিক্যে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করলো। স্বাভাবিক কারণেই চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণে ফিরে এলো ১৯৩৭-৩৯ সালের পরিবেশ।

কিন্তু নিয়ন্ত্রণের এই শৈথিল্যকে পুরোপুরি কাজে লাগাননি ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের দল, যেমন তাঁরা করেছিলেন ১৯৩৭-৩৮-৩৯ সালে। অবশ্য ভারতীয় চলচ্চিত্রক্ষেত্রেও ততদিনে এসেছে অনেক পরিবর্তন। এই পঞ্চম দশকে স্টুডিও-প্রথা হারিয়েছে তার শক্তি, কর্তৃত্ব আর স্থায়িত্ব। চলচ্চিত্র-উৎপাদনে স্থায়ী বিনিয়োগের মাত্রা কমে গিয়ে শুরু হয়ে গেছে ব্যাপক অস্থায়ী বিনিয়োগ। তথাকথিত ‘স্বাধীন’ প্রযোজকের দল স্টুডিও ভাড়া করে ছবি করছেন তখন—স্টুডিও-মালিকেরা নানা কারণে অনাগ্রহী হয়ে পড়েছেন ছবি-

প্রযোজনার ব্যাপারে। ছবির উৎকর্ষ নিয়ে মাথা ঘামাননি 'স্বাধীন' প্রযোজকের দল। যেসব 'স্বাধীন' প্রযোজকের ছবি বাজার থেকে ভালো পয়সা এনেছে, তাঁরা হয়তো আরো ছবি করার জন্যে উৎসাহ বোধ করেছেন। যাঁদের প্রথম ছবি পয়সা পায়নি আশানুরূপ, তাঁরা পত্রপাঠ পাততাড়ি গুটিয়েছেন। অবশ্য চলচ্চিত্র জগতে নতুন প্রযোজক আসা তার ফলে বন্ধ তো হয়ইনি, বরং বেড়েছে প্রতি বছর। এ-ধরনের প্রযোজকেরা আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বর্ধিত উৎপাদন এবং বাণিজ্য-সম্প্রসারণের দৌলতে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিলেন, যার একটা বড়ো অংশই ছিলো 'কালো টাকা'। এই 'কালো টাকা'-র উল্লেখযোগ্য একটা অংশই চলচ্চিত্র-প্রযোজনায় বিনিয়োজিত হয়েছিল, কারণ এখানে হিসাবের অঙ্কে কারচুপি করা খুবই সহজ।—'স্বাধীন' চলচ্চিত্র-প্রযোকদের কার্যকলাপের একটা ধারণা পাওয়া যাবে নিচের সারণী থেকে :

বছর	প্রযোজকের মোট সংখ্যা	নতুন প্রযোজকের সংখ্যা
১৯৪০	১০০	৪২
১৯৪১	১০৩	৪৬
১৯৪২	১০৮	৫৫
১৯৪৩	১১০	৪৬
১৯৪৪	৯৫	২৮
১৯৪৫	৮৪	১০
১৯৪৬	১৫১	৬৬
১৯৪৭	২১৪	১২৫

উল্লেখ করা মতো বিষয় হলো এই যে, ১৯৪৬ সালে মোট যে ১৫১ জন প্রযোজক ছবি করিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৯৪ জনই ১৯৪৭ সালে আর ছবি করাননি। ১৯৪৭ সালে মোট যে ২১৪ জন

প্রযোজক ছবি করিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১৬০ জনই ১৯৪৮ সালে আর এ-পথে আসেননি। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭, এই দুই বছরই ছবি করিয়েছেন, এমন প্রযোজকের সংখ্যা মাত্র ৫৮ জন।

অস্থায়ী প্রযোজকদের হাতে 'কালো টাকা'-র এই অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আরো কমে গেলো—শুরু হলো 'ফর্মুলা ফিল্ম'-এর চর্বিতচর্বন। সেন্সার-কর্তৃপক্ষও ফিরে গেলেন ছবিতে 'নৈতিক শিথিলতা', 'মদ্যপান', রুচিবিগর্হিত', 'নির্মম', 'যৌনতা' ইত্যাদি প্রসঙ্গ আবিষ্কারের গড্ডলিকা-প্রবাহে।

দুটি ছবির ক্ষেত্রে অবশ্য সেন্সার-এর তরফে রাজনৈতিক কারণে আপত্তি উঠতে পারতো—ওঠেনি। দুটি ছবির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীর দল।

১৯৪৬ সালে তৈরি চেতন আনন্দ-এর ছবি 'নীচা নগর'-এ শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসাসূত্র হিসেবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলা হয়েছিল। প্রচলিত সেন্সারনীতি উপেক্ষা করেই সেন্সার-পর্ষদ ছবিটিকে ছাড়পত্র দিলেন। ছবিটি অবশ্য দেশে জনপ্রিয় হয়নি। জনপ্রিয় হয়নি বাংলার বুকে নেমে আসা পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) ভয়াবহ মন্বন্তর নিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর ছবি 'ধর্‌তি কে লাল'-ও (১৯৪৬)।

পরাধীন ভারতে বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠন আর আন্দোলনের প্রায় পঁচিশ বছরের ইতিহাসে চলচ্চিত্র নিয়ে বামপন্থী উদ্যোগের এই দুটি মাত্র উদাহরণের খবরই আমরা জানি। চলচ্চিত্র বিষয়ে লেনিন-এর উচ্ছ্বসিত মূল্যায়ন সত্ত্বেও তাঁরা কেন এ-ব্যাপারে আরো বেশি নিষ্ঠাবান হননি, সে এক বিস্ময়। চতুর্থ দশকে, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, তাঁদের চেয়ে এ-ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন বরং কংগ্রেসী আদর্শে বিশ্বাসী সংস্কৃতি-কর্মীর দল।

চলচ্চিত্রের প্রভাব এবং তার সামাজিক ভূমিকা বিষয়ে এইসব তাৎক্ষণিক উপলব্ধি অবশ্য ম্লান হয়ে যায় বৃটিশ প্রশাসনের দূরদর্শিতার

পাশে। চলচ্চিত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক এবং সামগ্রিক একটি ধারণা তাঁরা অর্জন করেছিলেন, তা আমরা বিভিন্ন উদাহরণের সূত্রে জেনেছি। এ-ও জেনেছি যে, ভারতীয় চলচ্চিত্রে এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবসম্মত উপায়ে যাতে প্রতিফলিত না হতে পারে, তারও ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। বৃটিশ-প্রবর্তিত সেন্সার-বিধিনিষেধের নেতিবাচক পটভূমিকার এটিই একমাত্র 'ইতিবাচক' তাৎপর্য!